আজাদী সৈনিকের ডায়েরী

Made with by টেলি বই IN

t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান এখানে।

Generated from WikiSource

1. পাতার শিরোনাম
2. আজাদী সৈনিকের ডায়েরী
3. রেঙ্গুনে জাপানী আক্রমণ
4. বোমা বর্ষণ ও তাহার ফল
5. বার্মা ত্যাগের বৃথা চেষ্টা
6. জাপানী অধিকারের পূর্বে রেঙ্গুনের অবস্থা
7. জাপানী অধিকারের পর
8. ব্যাঙ্ককে ভারতীয় সম্মেলনে যোগদান
9. রাসবিহারী বসুর বক্তৃতা
10. সিঙ্গাপুর যাত্রা
11. জাপানীদের সহিত আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের গোলযোগ
12. পিনাং ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিবাদ
13. কর্ণেল গিল ও মোহন সিং-এর গ্রেপ্তার
14. রাসবিহারী বসু ও কর্ণেল ইওয়াকুরুর সাক্ষাৎ
15. নূতন সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা
16. সুভাষচন্দ্রের জার্মানী হইতে টোকিও আগমন
17. রেডিওতে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা
18. সিঙ্গাপুরে খাদ্যদ্রব্যের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি
19. সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসু
20. লেখকের সহিত রাসবিহারী বসুর আলোচনা
21. সিঙ্গাপুর সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ
22. আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট কুচকাওয়াজ
23. কেন আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি
24. সুভাষচন্দ্র কর্তৃক সর্বাধিনায়ক পদ গ্রহণ
25. স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গঠন ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ
26. আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের ঘোষণা
27. আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের কার্য্য
28. জাপান কর্তৃক আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট স্বীকার
29. সুভাষচন্দ্র কর্তৃক বণিক সভায় অর্থের জন্য আবেদন
30. ঝান্সীর রাণী বাহিনী
31. টোকিও হইতে তোজোর বক্তৃতা
32. আজাদী সৈনিকের প্রতিজ্ঞাপত্র
33. আজাদ হিন্দ গেজেট
34. ‘হিন্দী কওমি তরানা’—জাতীয় সঙ্গীত

35. আজাদ হিন্দ, সঙ্ঘের কার্যপ্রণালী—ভারতবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষা ও বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা
36. টোকিও মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষার্থী প্রেরণ
37. আজাদ হিন্দ বাহিনী সমূহের বিবরণ
38. সৈনিকদের পোষাক
39. সমর সঙ্গীত: কদম কদম বাড়ায়ে যা
40. ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা—জাপানী ও আজাদ হিন্দ্ যুক্ত কমিটির অধিবেশন
41. রেঙ্গুনে সৈন্য সমাবেশ ও উৎসাহ
42. ‘জয় হিন্দ’ অভিবাদন
43. ভারত আক্রমণকালে নেতাজীর বাণী—দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ
44. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের অধীনে
45. নেতাজীর প্রাণনাশের চেষ্টা
46. আরাকান রণাঙ্গনে
47. টামুর পথে যুদ্ধের বিবরণ
48. মণিপুরে জাতীয় বাহিনীর প্রবেশ
49. কোহিমা রণাঙ্গনে
50. নাগা পল্লীর নিকটে যুদ্ধ
51. কোহিমা অবরোধ
52. কোহিমা সহরে যুদ্ধ
53. প্রবল বর্ষায় পথের দুর্গমতা
54. রেঙ্গুনে প্রত্যাগমন
55. আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক
56. গান্ধীজীর প্রতি নেতাজীর আবেদন
57. মণিপুর অভিযানের ব্যর্থতার কারণ
58. মিংগালাদনে সেনা সমাবেশ ও বৃটিশের বোমাবর্ষণ
59. জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিবরণ
60. কিয়ঙ্ক পদাউঙ্গ
61. সান্ রাজধানী টউঙ্গগীতে নেতাজী
62. পোপা পাহাড় রণাঙ্গনে
63. প্যিনবিনের পথে যুদ্ধ
64. জ্ঞান সিংএর বীরত্ব
65. কর্ণেল সেহ্গলের দৈবক্রমে প্রাণরক্ষা
66. লেগ্যিতে বোমাবর্ষণ
67. তৌঙ্গউয়িঙ্গি ও ম্যাগউই
68. জাপানীদের রেঙ্গুন ত্যাগ

69. নেতাজীর শেষবাণী ও রেঙ্গুনত্যাগ
70. সম্পর্কে

1. আজাদী সৈনিকের ডায়েরী
2. সম্পর্কে

আজাদী
সৈনিকের ডায়েরী

লেফট্‌ন্যান্ট এম্. জি. মুল্‌কর, বি-এ

(ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্‌স্ লীগ ও আই-এন্-এ সংক্রান্ত কার্য্যাবলীর স্বাধীনতা যোদ্ধার রোজনামচার বঙ্গানুবাদ)

ওরিয়েন্টাল এজেন্সী
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৫২

প্রকাশক—এস, কে, আচার্য্য, বি-কম্
ওরিয়েন্টাল এজেন্সী
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার—বলদেব রায়

দি নিউ কমলা প্রেস

৭৷২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

লেফট্‌ন্যান্ট এ. জি. মুলকর্ রেঙ্গুনের অধিবাসী এবং জাপান কত্‌র্তৃক ব্রহ্মদেশ বিজয়কালে রেঙ্গুনে ছিলেন। তাঁহার পিতা পত্‌র্তুগীজ ভারতের গোয়া হইতে রেঙ্গুনে বাস করিয়াছিলেন এবং রেঙ্গুনে তাঁহার ব্যবসায় ছিল। তিনি শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং সুলেখক।

রেঙ্গুনের পতনের পর লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট মুলকর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কয়েক বৎসরের বিবরণ তিনি প্রতি দিন তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখেন। আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর বিপর্য্যয়ের পর ভারতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার সমস্ত জিনিষপত্র নষ্ট হইয়া যায়,কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রোজনামচার অধিকাংশই রক্ষা পাইয়াছে।

মূল ডায়েরীর মধ্যে লেখকের অনেক ব্যক্তিগত বিবরণ ছিল। যে সকল ঘটনার মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কোন সংবাদ্‌ নাই অথবা যাহা সাধারণের পক্ষে চিত্তাকর্ষক হইবে না তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। জাতীয় বাহিনীর সৈনিকদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের একটি সুন্দর চিত্রও এই ডায়েরী হইতে পাওয়া যায়।

রেঙ্গুনের পতন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাঙ্ককে রাসবিহারী বসু কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান্‌ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ্‌ গঠন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সিঙ্গাপুরে আগমন এবং আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা, আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনীর আরাকান, মনিপুর ও কোহিমা রণাঙ্গনে বীরত্বের কাহিনী, মনিপুর ও কোহিমায় স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা এবং শেষে বিপর্য্যয় ও নেতাজীর রেঙ্গুন ত্যাগের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ এই ডায়েরী হইতে পাওয়া যায়। এই ডায়েরীতে অপূর্ব প্রকাশিত বহু বিবরণ আছে। দিল্লীর বিচারকালে সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং যে সকল সৈনিক ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতেছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহাদের বর্ণনা হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত নেতাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের সামান্যমাত্র অসম্পূর্ণ বিবরণ পাইয়াছি। লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট মুলকরের ডায়েরী হইতে প্রথম এই সংগ্রামের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া গেল। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের নেতৃবৃন্দ এবং রাসবিহারী বসু ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লেখকের হইয়াছিল, এইজন্য এই ডায়েরীর মূল্য খুব বেশী। লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট মুলকরের রোজনামচা ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনায় সাহায্য করিবে।

প্রকাশক

সূচী

১৯৪১-৪২

রেঙ্গুনে জাপানী আক্রমণ ১৭
বোমা বর্ষণ ও তাহার ফল ১৮
বার্মা ত্যাগের বৃথা চেষ্টা ২৪
জাপানী অধিকারের পূর্বে রেঙ্গুনের অবস্থা ২৮
জাপানী অধিকারের পর ৩১
ব্যাঙ্ককে ভারতীয় সম্মেলনে যোগদান ৩৩
রাসবিহারী বসুর বক্তৃতা ৩৫
সিঙ্গাপুর যাত্রা ৩৬
জাপানীদের সহিত আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের গোলযোগ ৩৮
পিনাং ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিবাদ ৩৯
কর্ণেল গিল্ ও মোহন সিং-এর গ্রেপ্তার ৪০

১৯৪৩

রাসবিহারী বসু ও কর্ণেল ইওয়াকুরুর সাক্ষাৎ ৪১
নূতন সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা ৪২
সুভাষচন্দ্রের জার্মানী হইতে টোকিও আগমন ৪৩
রেডিওতে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা ৪৩
সিঙ্গাপুরে খাদ্যদ্রব্যের অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি ৪৪
সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসু ৪৬
লেখকের সহিত রাসবিহারী বসুর আলোচনা ৪৬
সিঙ্গাপুর সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ ৪৯
আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট কুচকাওয়াজ ৫০
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ৫০

সৈনিকদের প্রতি
কেন আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি ৫২
সুভাষচন্দ্র কতৃর্ক সর্বাধিনায়ক পদ গ্রহণ ৫৯
স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র গঠন ও মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ ৬১
আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের ঘোষণা ৬৩
মন্ত্রী সভা ৬৮
আজাদ হিন্দ সঙেঘর কার্য্য ৭০
জাপান কতৃর্ক আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট স্বীকার ৭১
বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ৭১
সুভাষচন্দ্র কতৃর্ক বণিক সভায় অর্থের জন্য আবেদন ৭১
ঝান্সীর রাণী বাহিনী ৭৩
টোকিও হইতে তোজোর বক্তৃতা ৭৮
আজাদী সৈনিকের প্রতিজ্ঞাপত্র ৮০
আজাদ হিন্দ গেজেট ৮১
'হিন্দী কওমি তরানা'—জাতীয় সঙ্গীত ৮৩
আজাদ হিন্দ, সঙেঘর কার্যপ্রণালী—ভারতবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষা ও বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ৮৪
টোকিও মিলিটারী একাডেমীতে শিক্ষার্থী প্রেরণ ৮৬
আজাদ হিন্দ বাহিনী সমূহের বিবরণ ৮৬
সৈনিকদের পোষাক ৮৭

১৯৪৪

সমর সঙ্গীত: কদম কদম বাড়ায়ে যা ৮৮

ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা—জাপানী ও আজাদ হিন্দ্ যুক্ত কমিটির অধিবেশন ৯০
রেঙ্গুনে সৈন্য সমাবেশ ও উৎসাহ ৯১
‘জয় হিন্দ’ অভিবাদন ৯১
ভারত আক্রমণকালে নেতাজীর বাণী—দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ ৯৩
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের অধীনে ৯৫
নেতাজীর প্রাণনাশের চেষ্টা ৯৫
আরাকান রণাঙ্গনে ৯৬
টামুর পথে যুদ্ধের বিবরণ ১০০
মণিপুরে জাতীয় বাহিনীর প্রবেশ ১০১
নেতাজী ও জেনারেল কাওয়াবের সম্মিলিত ঘোষণা ১০১
মণিপুরে স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ১০২
কোহিমা রণাঙ্গনে ১০৪
নাগা পল্লীর নিকটে যুদ্ধ ১০৯
কোহিমা অবরোধ ১১১
জি, টি, পাহাড়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা দখল ১১১
কোহিমা সহরে যুদ্ধ ১১২
প্রবল বর্ষায় পথের দুর্গমতা ১১৩
রেঙ্গুনে প্রত্যাগমন ১১৩
আজাদ হিন্দ্ ব্যাঙ্ক ১১৩
গান্ধীজীর প্রতি নেতাজীর আবেদন ১১৪
মণিপুর অভিযানের ব্যর্থতার কারণ ১১৭
মিংগালাদনে সেনা সমাবেশ ও বৃটিশের বোমাবর্ষণ ১২০

জার্মানীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিবরণ ১২১
হিটলারের সহায়তা ১২২

১৯৪৫

কিয়ঙ্ক পদাউঙ্গ ১২৮
সান্ রাজধানী টউঙ্গীতে নেতাজী ১২৯
টউঙ্গীতে বোমাবর্ষণ ১২৯
পোপা পাহাড় রণাঙ্গনে ১২৯
প্যিনবিনের পথে যুদ্ধ ১৩০
জ্ঞান সিংএর বীরত্ব ১৩১
কর্ণেল সেহ্গলের দৈবক্রমে প্রাণরক্ষা ১৩৮
লেগ্যিতে বোমাবর্ষণ ১৩৯
বিপক্ষের ঘাঁটি বিজয় ১৪০
তৌঙ্গউয়িঙ্গি ও ম্যাগউই ১৪০
নৈরাশ্যময় অবস্থা ১৪০
জাপানীদের রেঙ্গুন ত্যাগ ১৪৪
নেতাজীর শেষবাণী ও রেঙ্গুনত্যাগ ১৪৬

আজাদী ফোজের

সৈনিকের ডায়েরী

৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১: রেঙ্গুন:

জাপান গতকল্য অতর্কিতে পার্ল্ হারবার আক্রমণ করিয়াছে জাপানের যুদ্ধে যোগদান সম্বন্ধে যে সন্দেহ ছিল তাহা সত্য হইল। জাপান ও পার্ল্ হার্বার ব্রহ্ম হইতে অনেকদূর। যুদ্ধের ফলে আমার অসুবিধা জাপানী মালের কারবার বন্ধ।

৯ই ডিসেম্বর ১৯৪১:

আজকার সংবাদ খারাপ। জাপানীরা থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করিতেছে। বার্মাই কি তাহাদের লক্ষ্য?

রেঙ্গুনে আজ ভয়ানক চাঞ্চল্য। ভারতীয়দের মধ্যে একটা ভীষণ আতঙ্কের ভাব। জাহাজ কোম্পানির অফিসের সামনে জনসমুদ্র—সকলেই টিকিট কিনিতে চায়।

আমার অফিসের কেরাণী নায়ার নোটিশ দিল—জাহাজে স্থান পাইলেই দেশে ফিরিবে।

বাজারে অনেক টাকা বাকি পড়িয়াছে—সে হঠাৎ গেলে এই সব টাকা আদায় করে কে?

নায়ার বলিল—‘প্রাণ আগে; আপনার টাকা আদায়ের জন্য আমি মরিতে পারিব না!’

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১:

কেদা ও পেনাংএর পতন হইয়াছে।

জাপানীদের লক্ষ্য সম্ভবত সিঙ্গাপুর—বার্মা নয়। সিঙ্গাপুর দুর্ভেদ্য বন্দর; জাপানীদের সাধ্য নয় তাহা দখল করা। রেঙ্গুন আক্রমণের আশঙ্কার ভার মন হইতে অনেকটা নামিয়া গেল।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪১:

সাইরেনের শব্দ—উঁয়া-আ-আ—উঁয়া-আ-আ! নিশ্চয়ই সতর্ক করিবার মহড়া। কি বিশ্রী শব্দ! মনে হইতেছে যেন লক্ষ লক্ষ পুত্র শোকাতুরা জননী একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করিতেছে। বাতাস চিরিয়া সেই করুণ সুর চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। উয়া—আ-আ, উয়া—আ-আ-আ …। সাইরেন্ কিছুক্ষণ কাৎরাইয়া কাৎরাইয়া কাঁদিয়া চুপ করিল। রাস্তার যানবাহন-লোক চলাচল সব কখন থামিয়া গিয়াছে। চারিদিকে একটা গমগমে ভাব।

একটু পরেই কাণে গেল এরোপ্লেনের শব্দ—কিন্তু যেন অন্য ধরণের। ভম্-ভম্-ভম্ ভম্—যেন অসংখ্য ভীমরুল একসঙ্গে গুঞ্জন করিয়া উড়িয়াছে। জানালা হইতে দেখিলাম—প্রায় ৩৫।৩৬ খানা এরোপ্লেন ঝাঁক বাঁধিয়া চলিয়াছে অনেক উচ্চে।

দুরে ত্রস্ত আকাশের পটে এক ঝলক আলোক বিদ্যুতের তরবারির মতন ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বুক চিরিয়া একটা শব্দ হইল—সোঁ-ও-ও-ও। তারপরই—গুম্-গুম্-গুম-গুম্। বোমা পড়িতেছে। মনে হইল অফিস অঞ্চলে। আমার ঘরের জানালা-দরজা জিনিষপত্র মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

মেশিন গান্, এন্টি-এয়ারক্রাফ্ট্, বোমার শব্দ একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। মেঘে ও মাটিতে যুদ্ধ চলিয়াছে। আকাশে বাতাসে, মাটিতে চারিদিকে মৃত্যুর বন্যা। মনে হইতেছে— রেঙ্গুন শহর বুঝি আজ ধ্বংশ হইয়া যাইবে। মাথার উপরে মৃত্যুর দূত। হঠাৎ মুহূর্ত্তগুলি যেন অচল হইয়া গিয়াছে।

দেখিলাম—দূরে লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। নিবিড় ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে মাথা তুলিয়াছে।

আবার সাইরেন বাজিল—একটানা শব্দ। অল ক্লিয়ার্। যাক্— আজকার মতন আমরা বঁচিয়া গেলাম।

বোমার শব্দের তুলনায় বাড়ীঘরের ক্ষতি বেশী হয় নাই। কিন্তু অফিস অঞ্চলের রাস্তায় অনেক লোক মরিয়াছে। শেল্টার গ্রহণ না করাই তাহার কারণ।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্যামানন্দের নিকট শুনিলাম যে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দুইটি পাকা বাড়ী ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ঘরই নষ্ট হইয়াছে।

পাকা বাড়ীর এক তলায় থাকিলে এই বোমা হইতে অনেকটা নিরাপদ থাকা যায়।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪১:

আজ আবার রেঙ্গুনে বোমা পড়িল। সেদিন অপেক্ষা আজ লোক মরিয়াছে কম।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২:

জাপানীরা মৌলমেন্ ও মার্তাবান্ দখল করিয়াছে এবং সিতাং নদী পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।

রেঙ্গুনের অনেক দোকানে ধারে মাল দিয়াছি। কিন্তু যেখানে সকলেই যথাসর্ব্বস্ব ফেলিয়া পলাইতেছে, সেখানে আমার পাওনা টাকা আদায়ের সম্ভাবনা কোথায়? তবু চেষ্টা করিতেছি। পথেও তো খরচ আছে। ষ্টীমার ও এরোপ্লেনে জায়গা পাইবার আশা নাই। শেষে হয়তো হাঁটা পথেই যাইতে হইবে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪২:

দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুরেরও পতন হইয়াছে। রেঙ্গুন হইতে বেশীভাগ লোকই পলায়ন করিয়াছে। যে ২।১ জন চলিতেছে, তাহাদের মুখে উৎকণ্ঠার ভাব। পথে আয়ারকে একটি ল্যাঞ্চার (রিক্সার) উপর দেখিলাম। ছোট একটি মোট লইয়া চলিয়াছে। আমায় জিজ্ঞাসা করিল—‘আপনি এখনো আছেন?’ তারপর এদিক-ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় বলিল—‘জাপানীরা আসিয়া পড়িল যে।’

সত্যই কি জাপানীরা আসিতেছে? প্রকৃত সংবাদ কোথায় গেলে পাই? মনে পড়িল, রাও পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের অফিসে কাজ করে; সে হয়তো বলিতে পারে। চলিলাম স্ট্রাণ্ড রোডে পি-এম-জির অফিসে। কিন্তু অফিস প্রায় জনশূন্য।

এখান হইতে চলিলাম ‘সান্’ পত্রিকা অফিসে। তাহার নিশ্চয়ই সংবাদ রাখে। চারদিন কোন সংবাদপত্র বিক্রয় করিতে দেখি নাই। সান্ বর্মীদের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী দৈনিকপত্র। অফিসে গিয়া দেখিলাম তালা বন্ধ।

পথে ল্যাঞ্চার (রিক্সা) একটিও নাই। দু’একখানি গাড়ী কদাচিৎ চলিতেছে।

এক কাপ চা হইলে ভালো হইত। কিন্তু একটি দোকানও দেখিলাম না।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪২:

ঘরে চা আছে, কিন্তু দুধ ও চিনি নাই। অনেক কষ্টে উনান ধরাইয়া চা করিলাম। ভাগ্যে বিস্কুট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। কয়েকখানা বিস্কুট খাওয়া গেল।

ভোর বেলায়ই বাহির হইলাম মং সাইনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মাচেন্‌ট্‌ স্ট্রীটে। দোকানের উপরেই সে থাকে। তাহার সঙ্গে দেখা হইল। সে-ও বেশী কিছু খবর রাখে না। আমায় বলিল—‘ভারতের লোকেরা দেশে পলাইতেছে। কিন্তু আমাদের তো এই দেশ—আমরা পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব?’

এই সময় নাথুভাই আসিয়া পড়িলেন। তিনি মোটরে আসিয়াছিলেন। বলিলেন—‘পেট্রল্‌ পাইতেছি না। যাহারা এসেন্সিয়াল্‌ শ্লিপ্‌ পাইয়াছে তাহাদের অসুবিধা হইতেছে না। আজ বর্মা গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারির অফিসে এ বিষয়ে কথা বলিবার জন্য যাইব।’

নাথুভাই আমাকে বলিলেন—‘আসুন না, একটু ঘুরিয়া আসা যাক্‌।’ ভালোই হইল—আমিও তাহাই চাহিতেছিলাম। ডালহৌসি ষ্ট্রীটের অফিসে দুজনে গেলাম। চারিদিকে একটা নিস্তব্ধ সন্ত্রস্ত ভাব। তাঁহার পরিচিত এক সাহেবকে নাথু ভাই বলিলেন—‘সকলেই মোটরের জন্য ‘এসেন্সিয়াল্‌’ লেবেল পাইয়াছেন; আমায় একটা পাইয়ে দিন। বড় অসুবিধা হইতেছে।’

সাহেব ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—‘আর ‘এসেন্সিয়াল্‌’ লেবেলের প্রয়োজন হইবে না। আমার জিনিষপত্র বাঁধা রহিয়াছে; আমরা রেঙ্গুন ছাড়িয়া যাইতেছি। আপনার মোটরে শীঘ্র সম্ভব রেঙ্গুন ত্যাগ করুন।’

ম্লানমুখে নিঃশব্দে আমরা দুজনে বাহির হইয়া আসিলাম। হঠাৎ সাইরেন বাজিয়া উঠিল আহত কুকুরের করুণ আর্ত্তনাদের মতো। আকাশে জাপানী এরোপ্লেনের শব্দ—ভম্‌ ভম্‌-ভম্‌। রাস্তার পাশেই একটা বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। সৌভাগ্যক্রমে বোমা পড়িল না। জাপানী এরোপ্লেনগুলি শহরের উপর উড়িয়া উড়িয়া আবার দূরে মিলাইয়া গেল।

নাথুভাই এতক্ষণ পরে কথা বলিলেন—‘সাহেবরাও পলায়ন করিতেছে। পূর্ব্বে সুবিধা ছিল যাইবার; কিন্তু বাড়ী-ঘর ধন-সম্পত্তি যথাসর্ব্বস্ব আমার

এখানে। কি করিয়া ফেলিয়া যাই। তাই যাওয়া হয় নাই। এমন হইবে কে জানিত!'

এই অবস্থায় রেঙ্গুনে আর থাকা চলে না। দোকানপাট বন্ধ খাবার জিনিষ পাওয়া যায় না। এখানে থাকিলে না খাইয়া মরিতে হইবে। তাহার পর অরাজকতা, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের ভয়তো আছেই।

আমি বলিলাম—'আপনি যদি যান, আমায় সঙ্গে লইবেন।'

নাথুভাই উত্তর দিলেন—'আজই মুল্যবান জিনিষ মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিব; যদি কোনদিন ফিরিয়া আসি তা'হলে হয়তো সেগুলি পাইব। কাল সকালে আমি যাত্রা করিব। আপনাকে তুলিয়া লইয়া যাইব।'

নাথুভাইয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ভাবিলাম, এক শিশি এস্পিরিন্ কিনিয়া রাখি—কয়দিন যাবৎ মাথা ধরিতেছে। দে ব্রাদার্সের ডাক্তারখানা নিকটেই। সেখানে এস্পিরিন্ পাওয়া গেল। দে ব্রাদার্সের প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। গভর্ণমেন্টের আদেশ যে ডাক্তারখানা খুলিয়া রাখিতেই হইবে, তাই দোকান এখনো কোন রকমে খোলা রাখা হইয়াছে।

নাথুভাই তো বলিলেন, কাল সকালে নিজে আসিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু যদি না লইয়া যান্, তাহা হইলে মুস্কিলে পড়িব। আর কাহার মোটর আছে? ডাক্তার কুণ্ডু, লোক ভালো। রেঙ্গুনের নামজাদা ডাক্তার। তাঁহার সহিত পরিচয় সামান্যই। তবু চলিলাম তাঁহার বাড়ীতে।

ডাক্তার কুণ্ডু তাঁহার বাড়ীর দরজায়ই ছিলেন। তিনি তাঁহার চাকরদের উপর গরুর ভার দিয়া যাত্রার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। চাকরদের বলিলেন, নিকটবর্ত্তী গ্রামে আশ্রয় লইতে। বুঝিলাম—তাঁহার গাড়ীতে স্থানাভাব; সুতরাং নাথুভাই ছাড়া গতি নাই।

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪২:

ভোরবেলা এক সুটকেস্ হাতে চাঁদ সিং আসিয়াছেন বেসিন্ হইতে। তিনি বেসিনের কারেন্ স্কুলে কাজ করিতেন। আমায় বলিলেন—অনেক কষ্টে জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে রেঙ্গুনে আসিয়াছেন। বেসিনে জাপানীরা একদিন খুব বোমা ফেলে। বেসিন নদীর ধারে অনেক বাড়ী ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার বাসায়ও বোমা পড়ে; তিনি খুব অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান।

ষ্টীমারে ইরাবতী নদী দিয়া মান্দালয় যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানির ষ্টীমারে বা রেলে জায়গা পাওয়া যায় নাই।

আমি তাঁহাকে বলিলাম—'আমি আজই রেঙ্গুন ছাড়িয়া যাইতেছি এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

এই সময় নাথুভাই আসিয়া উপস্থিত। ভদ্রলোকের কথার ঠিক আছে। তাহার মোটরে চাঁদ সিংএরও স্থান হইল। তিন জনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

সুন্দর ছবির মত শহর—সোজা সোজা রাস্তা—আজ সমস্তই যেন প্রাণহীন। নীল আকাশের গায়ে সোনালি ফায়ার চূড়া নবোদিত সূর্য্যকিরণে তেমনি ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

পথে লোক চলিয়াছে, কিন্তু সবই অস্বাভাবিক। দলে দলে চলিয়াছে সর্বহারার দল। ইহাদের মধ্যে অনেকে বর্মায় আসিয়া বড়লোক হইয়াছিল: আজ আবার অদৃষ্টের ফেরে সমস্ত ফেলিয়া চলিয়াছে রিক্ত হস্তে। কেহ চলিয়াছে মোটরে, কেহ পায়ে হাঁটিয়া—কাহারও হাতে সুটকেশ, কাহারও পুঁটলি, কাহারও বা মাথায় বোঁচকা; তাহাতে তাহাদের যথাসর্বস্ব। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী ও মাদ্রাজীই বেশী—শিখও কিছু ছিল। মাদ্রাজীদের মধ্যে অনেক কুরঙ্গি রহিয়াছে—গায়ের রঙ ঘোর কালো, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ঝুঁটীর মতন বাঁধা; ইহারা এখানে কুলির কাজ করিত।

বর্মী পরিবারও চলিয়াছে অনেক। পরিধানে রঙিন লুঙ্গি ও গায়ে ছোট জামা—মেয়েদের চুলের গোছা চূড়ার মতো করিয়া বাঁধা।

মোটর ছুটিয়াছে। রেঙ্গুণ শহর ছাড়িয়া চলিয়াছি। থারাওয়ার্দির কাছে আসিয়া মোটর বিগড়াইল। মেরামত করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

রাত্রে একটা আস্তানা দরকার। দুরে একটা প্যাগোডা দেখা যাইতেছে—ওখানে আশ্রয় মিলিতে পারে। সেইদিকে তিন জনে চলিলাম।

প্যাগোডার দরজায় বর্মী ফুলওয়ালী ফুল ও মোমবাতি বিক্রয় করিতেছে। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে সারি সারি মোমবাতি জ্বলিতেছে। ফুঙ্গী ঘন্টা বাজাইয়া জয়মঙ্গল গাথা পাঠ করিতেছেন। জগদ্ব্যাপী এই মহাযুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের মধ্যে বুদ্ধদেবের মুখ তেমনি অচঞ্চল—অধরে তেমনি রহস্যময় হাসি। পূজারীগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল অহিংসার অবতার

বুদ্ধদেবের প্রতি আনুগত্য—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—ধম্মং শরণং গচ্ছামি। কিন্তু একা ব্রহ্মের নরনারী শরণ লইলে কি হইবে? যতদিন না সারা জগৎ অহিংসা মন্ত্রে ব্রতী না হয়, ততদিন যুদ্ধ চলিবে—সাইরেন বাজিবে—বোমা পড়িবে—মানুষ পতঙ্গের ন্যায় মরিবে।

ফুঙ্গীর অনুগ্রহে এক বর্মীর গৃহে আশ্রয় মিলিল। এই বিপদের সময় এই পরিবার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের যেভাবে অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন তাহা আমার চিরদিন মনে থাকিবে। বাড়ীর কর্ত্তার নাম মঙ্ মায়া।

ফুঙ্গী আমাদের মঙ্‌মায়ার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। ভদ্রলোক দরজায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা যাইতেই হাসিমুখে বলিলেন—‘লা গে ছেয়া’ (মহাশয়, আসুন)। আমার বর্মী ভাষার সামান্য জ্ঞান কাজে আসিল। নাথুভাই ও চাঁদ সিং বর্মী ভাষায় অনভিজ্ঞ।

রাত্রে তাহার স্ত্রী পরিবেশন করিলেন। বেশ সুশ্রী চেহারা; পরণে সিল্কের লুঙ্গী; মুখে তানাখা মাখা। খাবার মিলিল—ভাত, ডাল ও পাঁপর ভাজা। আজ তিনদিন পরে ভাত খাইতেছি। রান্না যেমনই হোক তৃপ্তির সঙ্গে খাইলাম।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২: প্রোম্:

প্রোমে আসিয়া আজ চারদিন বসিয়া আছি—ইরাবতী নদী পার হইবার কোন উপায় হইল না। একটা স্টীমার কালো ধোঁয়ায় আকাশকে আবিল করিয়া নদীর জলে তরঙ্গ তুলিয়া গেল। মিলিটারী যাইতেছে। সাম্পান একখানি আছে; কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা এত এবং তাহার খাঁই এত বেশী যে পারের আশা ছাড়িয়া দিলাম।

একটী সাম্পানে নথুভাইয়ের স্থান হইল অনেক টাকার বিনিময়ে। নাথুভাই বলিলেন—‘আমি চলিলাম। আমার মোটর আপনারা নিন— দেখুন যদি অন্য কোথাও হইতে যাইবার সুবিধা হয়।’

এখন এ অবস্থায় কি করা যায়? দু’জনে পরামর্শের পর ঠিক করিলাম—রেঙ্গুনেই ফিরিয়া যাই; তবু জানা জায়গা। শহরে না পাওয়া গেলেও কাছাকাছি কোন গ্রামে আশ্রয় লওয়া যাইবে। দেশে প্রত্যাগমনের যখন কোন আশাই নাই, তখন অগত্যা এই পরামর্শ ই অনুসরণ করিলাম। মোটর আবার রেঙ্গুনের পথে ফিরিল। মোটর চালনা জানা ছিল; বিদ্যাটা কাজে লাগিল।

কয়েক ঘণ্টা চলিবার পর মোটর বিগ্‌ড়াইল। সর্বনাশ, পেট্রল আর নাই — পাইবার সম্ভাবনাও নাই। কি করিব মোটর ফেলিয়া পায়ে হাঁটিয়া শেষে চলিতে হইল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২: পথে:

সন্ধ্যা ৭টা। পথ দিয়া দুজনে হাঁটিতেছি। রাস্তার অনতিদুরে মিলিটারী ছাউনি—মাঠের উপর কতকগুলি শাদা পাখীর মত দেখাইতেছে। আশ্রয় খুঁজিতেছি। এমন সময় সাইরেন্ বাজিল চারিদিকের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আহত কুকুরের কাতর আর্ত্তনাদের মতো। সঙ্গে সঙ্গে জাপানী এরোপ্লেনের গুঞ্জন বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

লোকালয়হীন পথের ধারে আশ্রয় কোথায় পাই? রাস্তার ধারে একটা খাদ দেখিলাম—একটা বড় গাছের নীচে। চাঁদ সিংকে বলিলাম—'আসুন এইটার মধ্যে আশ্রয় লই।'

চাঁদ সিং বলিলেন—গর্ত্তের মধ্যে বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। জাপানীরা হয়তো বৃটিশ তাঁবু আক্রমণ করিবে। এখানে রাস্তায় থাকা আর গর্ত্তের মধ্যে থাকা একই কথা।

আমি বলিলাম—'আপনি তাহা হইলে থাকুন, আমি 'শেল্‌টার' লই।'

এমন সময় আলোকের ঝলকে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল ও বোমা পড়িতে আরম্ভ হইল। পায়ের নীচে মাটি কঁপিয়া উঠিল—গর্ত্তের মধ্যে ছিট্‌কাইয়া এক পাশে পড়িয়া গেলাম। মাথার উপর দিয়া অসংখ্য অগ্নিস্‌ফুলিঙ্গ চলিয়া গেল। আবার সেইরকম শব্দ— গুম্ গুম্ গুম্। তারপর বোমা বর্ষণ থামিয়া গেল। এরোপ্লেনের বোঁ-ও-ও-ও শব্দ যেন দুরে অতি দূরে মিলাইয়া গেল।

ধীরে ধীরে খাদ হইতে রাস্তার উপর উঠিলাম। চাঁদ সিংকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। সাড়া পাইলাম না। পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম তাহার খোঁজে।

রাস্তার উপর কি যেন একটা পড়িয়া আছে। কাছে গিয়া দেখি— চাঁদ সিং। গায়ে হাত দিয়া ডাকিলাম—সাড়া নাই। গা হিমের মতো ঠাণ্ডা নাড়ী নিস্পন্দ— সারা দেহ রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। টর্চ জ্বালিয়া দেখিলাম বোমার স্‌প্লিন্টারে তাহার পেট কাটিয়া নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সজলচক্ষে মৃতদেহ পথের ধারে একটি খাদে সমাহিত করিলাম। তারপর আবার চলিলাম; এবার একা।

৭ই মার্চ ১৯৪২: রেঙ্গুন:

আবার রেঙ্গুনে। জনমানবশূন্য রাস্তা। অধিকাংশ বাড়ীরই দরজা-জানালা খোলা। রাস্তার উপর মধ্যে মধ্যে জিনিসপত্র পড়িয়া আছে।

একদল বার্মিজ কতকগুলি মোট লইয়া যাইতেছিল; নিশ্চয়ই লুন্ঠিত দ্রব্য।

বাসায় পৌঁছিলাম। টর্চের সাহায্যে আমার ঘরে গিয়া দেখিলাম—আলমারি ভাঙ্গা—কাপড়চোপড় কিছুই নাই।

একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হইল। জানালা হইতে দেখিলাম, দূরে একটা বিরাট ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এ সব কি?—রেঙ্গুনে কি জাপানীরা আসিয়া পড়িয়াছে—না, ইংরাজরাই এগুলি নষ্ট করিতেছে?

সকালের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এখনি একবার শহরটা ঘুরিয়া পাকা খবর সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্ধকারেই সুবিধা।

পথে একজন বর্মীর সহিত দেখা হইল। সে বলিল—‘ইংরাজেরা পলায়ন করিতেছে; জাপানীরা আসিতেছে। জেল হইতে কয়েদীদের ছাড়িয়া দিয়াছিল; তাহারা শহর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছে।’

অনতিদূরে একটা দোকানের দরজা খোলা। হারিকেন জ্বলিতেছে দেখিয়া অগ্রসর হইলাম।—দেখিলাম—সেটি মদের দোকান। কয়েকজন শিখ হল্লা করিয়া বোতল হইতে মদ ঢালিয়া খাইতেছে। একজন নৃত্য করিতেছে।

কাছেই একটা বাড়ীতে অংফয়া ও তাহার বৃদ্ধা মা থাকে। তাহাদের সিগারেটের কারবার। উপরের জানালায় দাঁড়াইয়া অংফয়া। নাম ধরিয়া ডাকিলাম। ফয়া দরজা খুলিয়া আসিতে বলিল।

আমি বলিলাম—‘তোমরা এখনো আছ? তোমার মা কোথায়?’

ফয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার মা কয়েকদিন হইল মারা গিয়াছে—রাস্তায় বোমার আঘাতে। সে একা। রেঙ্গুন হইতে ১০ মাইল দূরে তাদাগালে গ্রামে

তাহার দিদিমা থাকেন। কিন্তু যে রকম লুঠতরাজ চলিয়াছে, ভয়ে সে ঘরের বাহির হয় নাই। প্রায় সব বড় বড় বাড়ীতেই লুঠ হইয়াছে।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আমার অবস্থাও বলিলাম। আমাকে বলিল —'আপনি যদি আমায় তাদাগালে লইয়া যান, সেখানে দিদিমার কাছে আপনি থাকিতে পারিবেন।' এ যুক্তি মন্দ নয়।

ফয়া তাহার জিনিসপত্র একটা ছোট ব্যাগে ভরিয়া আমার সঙ্গে বাহির হইল। আমিও বাসা হইতে আমার সুট্‌কেশটি লইলাম। ফয়ার একটা রিভল্‌ভার ছিল। দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে চলিলাম।

কয়েকদিনের অর্দ্ধাহারে ও অনশনে ফয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত দিন পথশ্রমে আমার দেহও অবসন্ন। এইভাবে আমরা দু'জনে প্রায় ৭ মাইল পথ চলিয়াছি—তাদাগালে বোধ হয় আর বেশী দূর নয়। এমন সময় মাথার উপর কয়েকটা এরোপ্লেন্ আসিয়া পড়িল—এক ঝাঁক ভীমরুলের মতন তাহাদের গুঞ্জন নিস্তব্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

ফয়া বলিল—'জাপানী এরোপ্লেন। আমার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না।'

রাস্তার ধারে একটা গাছের নীচে তাহাকে শয়ন করাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সে মূর্চ্ছা গেল। একটা ছোট ফ্লাস্কে জল ছিল; একটু লইয়া তাহার মুখে চোখে দিলাম। আকাশে গুঞ্জন ধ্বনি অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল।

ফয়ার তখনো জ্ঞান হয় নাই। কোলের উপর মাথাটি তুলিয়া লইলাম। নাড়ী ভালোই মনে হইল—যদিও একটু দুর্বল। কিছুক্ষণ পরে সে চোখ চাহিল।

বলিলাম—'ভয় নাই; এরোপ্লেন চলিয়া গিয়াছে। তুমি বড় দুর্বল, এখন উঠিতে চেষ্টা করিও না; আমরা না হয় একটু বিশ্রাম করিয়া যাইব।'

ঊষার অস্পষ্ট আলোকে ফয়ার মুখখানি এক অপূর্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিটোল সর্বাঙ্গে উচ্ছ্বলিত ভরা যৌবন। গোলাপী রঙের রেশমি লুঙ্গি ও ব্লাউজের রঙ্ তাহার গায়ের রঙের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলাম। সে নিঃশব্দে চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল।

বেশী দেরী করা উচিত নয়। জাপানীরা যদি আসিয়া পড়ে, আমরা পথের মাঝখানে বেড়াজালের মধ্যে পড়িয়া যাইব।

ফয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুজনে আবার চলিলাম।

ফয়ার দিদিমা নাতনীকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। আমারও আশ্রয় মিলিল।

২রা মে ১৯৪২: তাগাগালে:

জাপানীরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেই আছি। দেশব্যাপী অরাজকতার মধ্যে এই বর্মী পল্লীর মধ্যে ভালোই আছি বলিতে হইবে। ফয়ার দিদিমার কিছু ধান লুকানো আছে; তাহাতেই চলিয়া যাইতেছে।

বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে কোন খবর পাইবার উপায় নাই। ঠিক করিলাম, একবার রেঙ্গুন ঘুরিয়া আসিব। ফয়া কিছুতেই যাইতে দিবে না। আমার যাইবার কথা শুনিয়া অবধি কাঁদিতেছে। তাহাকে বুঝাইলাম— এখনতো এখানে যুদ্ধ হইতেছে না, সুতরাং বিপদের ভয় আর নাই।

৩রা মে ১৯৪২:

আজ সকালে রেঙ্গুন যাত্রা করিব। সবে রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে; অস্পষ্ট আলোকের ঢেউ আসিয়া রাত্রির অন্ধকারকে হাল্‌কা করিয়া আনিয়াছে। এমন সময় ঘরে কে আসিল?—ফয়া!—ফয়াই তো!

ফয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল—‘বল, তুমি ফিরিয়া আসিবে।’

অং-ফয়া আমায় ভালবাসিয়াছে। তাহার এ ভালবাসার মর্য্যাদা দিবার ক্ষমতা আমার কোথায়? তাহাকে বলিলাম—‘আবার ফিরিব।’ তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলাম।

৪ঠা মে ১৯৪২: রেঙ্গুন

রেঙ্গুনে আমার বাসায় ফিরিয়াছি। শহরে লোক খুবই কম। রেঙ্গুনের সে সৌন্দর্য্য আর নাই।

একদল জাপানী সিপাহী মার্চ্‌ করিয়া চলিতেছে। মাথার উপর কয়েকখানি এরোপ্লেন্‌ উড়িয়া গেল।

পথে ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—‘আপনিতো পূজার সময় দেশে গিয়াছিলেন; বর্মায় কবে আসিলেন?’

‘দাদা, বৌদি রেঙ্গুনে ছিলেন; খবর না পাওয়ায় ২রা জানুয়ারী অনেক কষ্টে এরোপ্লেনে ফিরিয়া আসি তাঁহাদের খোঁজে। আসিয়া জানিলাম—তাঁহারা হাঁটা পথে দেশের দিকে রওনা হইয়াছেন। আমি আর ফিরিতে পারিলাম না। যখন জাপানীরা আসে আমি তাহাদের হাতে পড়ি। ভারতীয় হিন্দু জানিয়া আমায় ছাড়িয়া দেয়।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— ‘এখনো কি ব্যবসায় করিতেছেন?’

‘না। আমি ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্‌ লীগ) কাজ করিতেছি।’

‘সে আবার কি?’

‘রাসবিহারী বসুর নাম শুনিয়াছেন তো?’

‘হাঁ শুনিয়াছি। সেই যিনি ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া জাপানে গিয়াছিলেন?’

‘হাঁ। রাসবিহারী বসু গত মার্চ মাসে টোকিওতে পূর্ব এশিয়ায় প্রবাসী ভারতবাসীদের একটা সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২৮শে হইতে ৩০শে মার্চ, তিন দিন এই সম্মিলন হয়। রাসবিহারী বাবু সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।’

‘জাপানীরা কি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে?’

‘না। বার্মা তাহারা দখল করিয়াছে। জাপানীরা নিজেরা ভারত আক্রমণ না করিয়া আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে। আপনিও আসুন আমাদের সঙ্গে।’

আমি বলিলাম—‘আমার এখন দরকার অন্নের ব্যবস্থার।’

‘তাহার জন্য চিন্তা নাই। আমি সব ব্যবস্থা করিয়া দিব।’

যাক—উপস্থিত অনাহার হইতে রক্ষা পাইলাম।

৯ই জুন ১৯৪২:

আজ ব্যানার্জি বলিলেন—‘ব্যাঙ্ককে আমাদের একটা বিরাট সম্মেলন হইবে। রাসবিহারী বাবু উপস্থিত থাকিবেন। আপনি যদি যাইতে চাহেন আমি লইয়া যাইতে পারি।’

রেঙ্গুন আর ভালো লাগিতেছে না—রাজি হইলাম।

১০ই জুন ১৯৪২:

আজ খুব ভোরে আমি, ব্যানার্জি ও আরও দুইজন একসঙ্গে একটা মোটরে এরোড্রামে গেলাম।

এরোপ্লেন্‌টির ভিতরে আটজনের বসিবার জায়গা। প্রত্যেকটি চেয়ারে গদি আঁটা— সামনে একটুখানি টেবিল। বেশ আরামে যাওয়া যাইবে।

১৫ই জুন ১৯৪২: ব্যাঙ্কক্:

আজ সম্মেলনের সভাপতি রাসবিহারী বসু বিবর্ণ রঞ্জিত কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা গান্ধীর এক প্রকাণ্ড ছবি রহিয়াছে।

সভায় এক শত দশজন প্রতিনিধি আসিয়াছেন; জাপান, চীন, জাভা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বোর্ণিও, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, বার্মা প্রভৃতি নানা দেশ হইতে।

ব্যানার্জি বলিলেন—‘ইংরেজরা যখন জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন অনেক ভারতীয় সৈনিক ধরা পড়ে। ইহাদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছায় ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছে।

কর্ণেল মোহন সিং, কর্ণেল জি. কিউ. গিলানি এবং কর্ণেল এন্. এস্. গিল্‌কে দেখিলাম। মালয়ের এন্ রাঘবন, দেবনাথ দাস এবং এ. এম. সহায় রাসবিহারী বসুর নিকটে বসিয়াছিলেন। দেখিলাম—ব্যানার্জির বেশ খাতির।

২৩শে জুন ১৯৪২:

নয় দিন অধিবেশনের পর আজ সম্মেলন শেষ হইল। ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই অধিবেশনে উহা ঘোষণা করা হইল। রাসবিহারী বসু সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। সভার প্রধান অফিস হইবে সিঙ্গাপুরে।

এই কয়দিন সভায় প্রায় ৬০।৭০ টি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। তাহার মধ্যে এই কয়টি উল্লেখযোগ্য:—

(ক) পুর্ব্ব-এশিয়ার সকল প্রবাসী ভারতীয়দের বিশেষত অসামরিক ব্যক্তিগণকে সঙঘবদ্ধ করিতে হইবে এবং এমন একটি সঙঘ স্থাপন করিতে হইবে যাহা ভারতবাসীগণের ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা ও তাহাদের মঙ্গল করিতে পারে। এই সঙ্ঘের নাম হইল ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেণ্ডেন্স লীগ। প্রত্যেক দেশে ইহার একটি করিয়া শাখা থাকিবে।

(খ) ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কার্য্য ভারতীয় ভিত্তিতে চলিবে—সাম্প্রদায়িকভাবে নয়।

(গ) ভারতীয় স্বাধীনতা সদ্য কংগ্রেসের নীতি অনুসারে পরিচালিত হইবে।

(ঘ) ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বাহিনী গঠিত হইবে এবং মোহন সিং হইবেন তাহার অধিনায়ক (জি. ও. সি.)। ভারতীয় স্বাধীনতা সঙঘ ইহার জন্য সৈন্য, অর্থ, পোষাক ও খাদ্য সরবরাহ করিবে এবং প্রয়োজন হইলে জাপানী গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি, জাহাজ ও এরোপ্লেন্ লওয়া হইবে। ইহা কেবলমাত্র ভারতীয়গণের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় স্বার্থে চালিত হইবে।

সেনাদলের জন্য পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহে সচেষ্ট হইতে আবেদন জানাইলেন মোহন সিং।

রাসবিহারী বসু বলিলেন—পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে প্রায় ৩০ লক্ষ ভারতবাসী বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে। জাপানী বিজয়ের ফলে এই সকল দেশের পুরাতন শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নুতন শাসন ব্যবস্থা গড়িতে সময় লাগিবে। জাপান এখন যুদ্ধ লইয়া ব্যস্ত। অনেক স্থানে অরাজকতার ফলে বেসামরিক অধিবাসীরা নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। দস্যু, তস্কর ও লুণ্ঠনের হাত হইতে ভারতবাসীদের রক্ষার জন্য আমাদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্যই সংগঠনের প্রয়োজন। জাপানীরা আমাদের নিজস্ব সেনাদল গঠন ও ভারতীয়দের রক্ষার ব্যবস্থা করিতে দিতে সম্মত আছে। আমরা যদি আমাদের জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার জন্য ইচ্ছা করি, আমাদের ইহা একটী সুবর্ণ সুযোগ। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আমরা চাই না যে জাপান ভারতবর্ষ অধিকার করে; আমাদের উদ্দেশ্য হইবে ভারতীয় বাহিনী গঠন করিয়া আমরাই আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করিব। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন ভারতের নেতাগণ।

এই কয়জন কর্ম পরিষদের সদস্য হইলেন—

সামরিক সদস্য—কাপ্তেন মোহন সিং, কর্ণেল গিলানি ও জগন্নাথ রাও ভোঁসলে;

অসামরিক সদস্য: মেনন, রামন ও বোহা।

সভাপতি—রাসবিহারী বসু।

১২ই জুন ১৯৪২: ব্যাঙ্কক্:

আজ ঠিক করিলাম ব্যানার্জির সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাইব। ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগে একটি কাজ পাওয়া যাইবে। আমার কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এখন রেঙ্গুনে ফিরিয়া কোন লাভ নাই।

একটি জাহাজে মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিলাম।

দূরে সিঙ্গাপুর। সমুদ্রের ধারের কারখানা হইতে গগনস্পর্শী চিমনি দেখা যাইতেছিল। একখানা ছোট মোটর বোটে পাইলট্ আসিয়া জাহাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিল। জাহাজ ধীরে ধীরে হার্বারের পথে অগ্রসর হইল।

সিঙ্গাপুর সুন্দর শহর। মোটরে ব্যানার্জির সঙ্গে তাহার বাসায় পৌঁছিলাম। সিঙ্গাপুর নাম পরিবর্তিত করিয়া জাপানীরা ইহার নূতন নামকরণ করিয়াছে—শোনান্। সিঙ্গাপুর—সংস্কৃত সিংহপুর—প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজয়ের স্মৃতি বিজড়িত। সেই স্মৃতির বিলোপ করা উচিত হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রধান অফিস ব্যাঙ্ককে; সিঙ্গাপুরের অফিস তাহার অধীন।

২০শে আগষ্ট ১৯৪২: সিঙ্গাপুর:

আজ মেহের খাঁর নিকট সিঙ্গাপুরের পতনের গল্প শুনিলাম।

মেহের খাঁ বলিল—

‘সিঙ্গাপুরে ইংরেজরা ১৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯৪২) জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৬ই তারিখে সন্ধ্যায় খবর পাইলাম, পরের দিন ভারতীয় সৈনিকদের ফেরার্ পার্কে সমবেত হইতে হইবে।

১৭ই ফেব্রুয়ারি আমরা আদেশমত ফেরার্ পার্কে জড় হইলাম। কর্ণেল্ হান্ট্ আমাদের বলিলেন —‘আমরা সকলেই বন্দী হইয়াছি; আমি তোমাদের

জাপানের প্রতিনিধি মেজর ফুজিওয়ারার হাতে সমর্পণ করিতেছি। এখন হইতে তোমরা তাঁহার আদেশ পালন করিবে।'

'তারপর মেজর ফুজিওয়ারা একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বলিলেন—'জাপান চাহে পূর্ব এশিয়ার সকল জাতি স্বাধীন হয় এবং সকলে পরস্পরের সহিত সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এক শক্তিশালী জাতি সঙ্ঘে পরিণত হয়। পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য স্বাধীন ভারতের প্রয়োজন। ভারতবাসীগণ যাহাতে তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে এজন্য সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে জাপ গভর্নমেন্ট প্রস্তুত। আপনারা ভারতবাসী—আপনাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আপনাদেরই চেষ্টা করা উচিত। ভারতবাসীদের আমরা বন্ধু বলিয়াই মনে করি। আপনাদের আমরা যুদ্ধ বন্দী বলিয়া মনে করি না। আপনারা স্বাধীন।'

'ইহার পর কাপ্তেন মোহন সিং বলেন—'মালয় যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধের সুযোগ পায় নাই। তাহার প্রথম কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়; তাহা ছাড়া, আমাদের পদাতিক সৈন্য দলকে সাহায্য করিবার জন্য না ছিল এরোপ্লেন না ছিল পর্য্যাপ্ত অস্ত্র। বৃটিশরা আমাদের জাপানীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার এই অবসর। ভারতের নিজস্ব কোন বাহিনী নাই; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সেনাবাহিনী গঠনের একটা বড় সুযোগ আমরা পাইতেছি। আমাদের উচিত এই জাতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদান করা।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'সভায় লোক কত ছিল?'

'প্রায় ৪০।৫০ হাজার হইবে।'

'এত?'

'হাঁ, ভারতীয় সেনাদল তো ছিলই, তাহা ছাড়া সিঙ্গাপুরের অনেক বেসামরিক ভারতীয় অধিবাসীও আসিয়াছিলেন।'

'ইহার পর আপনারা কি করিলেন?'

'আমাদের মধ্যে অধিকাংশই 'আই-এন্-এ' তে যোগদান করিলাম।'

'আপনাদের কি যোগ দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল?'

'না—কাহাকেও বাধ্য করা হয় নাই। আমরা বুঝিয়াছিলাম যে সকলের অপেক্ষা দেশই বড় এবং আমাদের অনুগত্য দেশের কাছেই— অন্য কাহারও নিকট নয়।'

'আপনাদের তো জাপানীরা ছাড়িয়া দিল। আপনাদের কি করিয়া চলিত?'

'আমাদের কয়েকটি ক্যাম্পে রাখা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ক্রানজি ক্যাম্প্, সেলেতার ক্যাম্প ও বিদাদারি ক্যাম্প্ প্রধান। কাপ্তেন মোহন সিং আমাদের সব ব্যবস্থা করেন।

মার্চ মাসের ২৮শে হইতে ৩০শে পর্য্যন্ত টোকিওতে প্রবাসী ভারতবাসীদের এক সভা হয়। রাসবিহারী বসু সভাপতি হন। এই সভায় ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাপ্তেন মোহন সিং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কার্য্য আরম্ভ করেন। হাতের কাছেই ছিল বন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ; প্রথমে তাহাদের লইয়াই এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হইল।'

১লা ডিসেম্বর ১৯৪২:

জাপানীদের সঙ্গে গোলযোগ বাধিয়াছে। ইণ্ডিপেন্ডেন্স্ লীগের কর্ম পরিষদের (কাউন্সিল অফ্ এ্যাকসন্) কার্য্যে জাপানী কত্র্তৃপক্ষ প্রায়ই বাধা দিতেছে। জাপ সেনা বাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি যোগাযোগ বিভাগ আছে—তাহার নাম ইওয়াকুরে কিকান্। কিকান্ চাহে কর্ম পরিষদ এবং আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীকে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত করিতে।

কর্ম পরিষদের বিনা অনুমতিতে কয়েকজন ভারতীয়কে জাপানীরা সাবমেরিনে করিয়া ভারতে পাঠাইয়াছে গুপ্তচরের কাজ করিবার জন্য। পিনাংএর ইণ্ডিয়ান্ ইনষ্টিটিউট্ ইহার প্রতিবাদ করে; কিন্তু জাপানীরা তাহা শুনে নাই। ইহার ফলে ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণ তাঁহাদের সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৪২:

জাপানীরা একদল ভারতীয় সেনা ব্রহ্মদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে চায়। কর্ম পরিষদ চাহেন—ভারত আক্রমণের পূর্বে জাপানীদের সঙ্গে একটা ভালোরকম মীমাংসা; জাপানীরা প্রতিশ্রুতি দিবে যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবে। এখন অর্থ ও অস্ত্রের জন্য তাহাদের উপর নির্ভর করা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। এ অবস্থায় তাহারা আমাদের এই অসহায় অবস্থার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। যদি যুদ্ধ করিতে হয় ভারতীয় সৈন্যরাই তাহা করিবে।

ভারতীয় সৈন্যদের বার্মায় লইয়া যাইবার জন্য একটা জাহাজ আসিয়াছিল; খালি ফিরিয়া গেল। জাপানী কত্র্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি?

৮ই ডিসেম্বর ১৯৪২:

আজ জাপানীরা কর্ণেল এন্, এস, গিল্‌কে গ্রেপ্তার করিয়াছে; কারণ বার্মায় সৈন্য প্রেরণে অসম্মতি।

রাসবিহারী বসুর চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি টোকিও গিয়া এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন এবং জাপানীদের স্পষ্ট নীতি জাপ গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে দাবি করিবেন।

রাসবিহারী বসু ও মোহন সিংএর মধ্যেও গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। রাসবিহারী বসু ও রাঘব প্রভৃতি বেসামরিক নেতারা চাহেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের সম্পূর্ণ অধীন থাকে। গত জুন মাসে ব্যাঙ্কক সম্মিলনে মোহন সিংএর উপর ফৌজের ভার দেওয়া হয়। সঙ্ঘই যখন মূল প্রতিষ্ঠান তখন ফৌজ তাহার অধীনে থাকা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু মোহন সিং চাহেন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

৯ই ডিসেম্বর ১৯৪২:

আজ মোহন সিং তাঁহার বাংলোয় অফিসারদের আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—ব্যাঙ্কক সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি জাপ গভর্ণমেন্ট্ এখনো অনুমোদন করেন নাই। স্থানীয় জাপ কর্তৃপক্ষের আচরণও আশাজনক নয়। তাহা ছাড়া তাঁহার মতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের অধীনে হওয়া অসুবিধাজনক।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৪২:

আজ টোকিও রেডিওতে শুনিলাম—জাপানী এরোপ্লেন কলিকাতার ডক অঞ্চলে ও বজবজে পেট্রলের ট্যাঙ্কের উপর বোমা ফেলিয়াছে।

এবার ভারতবর্ষের পালা।

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪২:

এই কয়দিনে অনেকগুলি ঘটনা হইয়াছে। জি-ও-সি মোহন সিং এবং আরও দুইজনকে জাপানীরা গ্রেপ্তার করিয়াছে। সৈনিকদের মধ্যে খুব অসন্তোষ চলিয়াছে এবং অনেকেই তাহাদের ব্যাজ্ ফেরত দিয়াছে। আই-

এন্‌-এ প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভারতবাসীমাত্রেই দুঃখিত। গোলযোগের সংবাদ পাইয়া রাসবিহারী বসু আসিয়াছেন। কর্ণেল ইওয়াকুরুর সঙ্গে তাঁহার নাকি অনেকক্ষণ কথা হইয়াছে। কর্ণেল শা নওয়াজও তাঁহার সহিত ছিলেন।

৫ই জানুয়ারি ১৯৪৩:

কর্ণেল ইওয়াকুরুর সহিত আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে জাতীয় বাহিনীতে যোগদান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক হইবে। কাপ্তেন মোহন সিং যে সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, তাহার স্থানে একটি নূতন সেনাদল গঠনের চেষ্টা হইতেছে। কর্ণেল শা নওয়াজ্ এজন্য খুব পরিশ্রম করিতেছেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩:

রাসবিহারী বসু সিঙ্গাপুরে আসিয়াছেন। যে সকল সৈনিক জাতীয় বাহিনীতে থাকিতে অসম্মত আজ তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জ্জিও বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহ দেখা গেল না।

মালয় ও সিঙ্গাপুরের সাধারণ ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। ইহার উপর জাপানীদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীনতা সঙ্ঘের মালয় শাখার সভাপতি এন্. রাঘবন্ পদত্যাগ করায় জাপানীদের বিরুদ্ধে মনোভাব খুবই প্রবল।

১৫ই এপ্রিল ১৯৪৩:

আজ ক্যাম্পে সেনা সংগ্রহের জন্য একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। কর্ণেল শাহ নওয়াজ্, কাপ্তেন গুরুবক্স ধীলন এবং মেজর ধারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শাহ নওয়াজ্ ও ধীলন দু'জনেই পঞ্জাবী এবং বৃটিশ রেজিমেন্টে ছিলেন। ধীলন জাতিতে শিখ। শাহ নওয়াজ্ লাহোর হাইকোর্টের এক জজের পুত্র।

শাহ নওয়াজ্ বলিলেন—'আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিবেন তাঁহারা আসিবেন টাকার লোভে বা মাহিনার প্রলোভনে নয়—দেশের প্রতি ভালবাসার টানে। তাঁহারা পাইবেন শুধু সামান্য হাতখরচ। যদি আমাদের সুদিন আসে, তখন আমরা সকলেই পূরা বেতন পাইব।'

একজন সৈনিক বলিল—'জাপানীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের প্রলোভনে ভুলাইয়া ভারতবর্ষ নিজেরাই গ্রাস করিতে পারে।'

মেজর ধারা বলিলেন—'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হইয়াছে ভারতের স্বাধীনতার জন্য। আমরা যদি দেখি জাপানের উদ্দেশ্য খারাপ, তাহা হইলে জাপানীদের সহিতও যুদ্ধ করিব।'

আজ সভাস্থলে শুনিলাম, সুভাষচন্দ্র বসু নাকি জার্মানি হইতে টোকিওতে আসিয়াছেন।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৪৩:

সিঙ্গাপুরে পূর্ব্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইয়া গেল। রাসবিহারী বসু এই সভায় ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে আসিতেছেন এবং তাঁহার হস্তে সকল দায়িত্ব অর্পণের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন।

আমি আজ প্রায় ১২ দিন জ্বরে শয্যাগত। ইচ্ছা সত্ত্বেও সভায় যোগ দিতে পারিলাম না।

রাসবিহারী বসুর উপর সকলেরই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু গত কয়েক মাসের ঘটনার ফলে সকলের ধারণা হইয়াছে যে তাঁহার মধ্যে দৃঢ়তার অভাব। এজন্য সুভাষচন্দ্র বসু ভার লইবেন, এ সংবাদে সকলেই আনন্দিত মনে হইল।

৩০শে এপ্রিল ১৯৪৩:

আজ অফিসে সুভাষচন্দ্র বসুর বাণী দেখিলাম। জার্মানি হইতে টোকিও পৌঁছিয়া তিনি ইহা দেন।

‘গত মহাযুদ্ধের সময় আমাদের নেতৃবৃন্দ চতুর বৃটিশ রাজনীতিকদের ভাঁওতায় ভুলিয়া প্রতারিত হইয়াছিলেন। এইজন্য বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তাহাদের দ্বারা আর কখনও প্রতারিত হইব না। বিশ বৎসর ধরিয়া আমরা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছি এবং সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছি। সেই সময়—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্ত আজ আসিয়াছে। আমরা জানি—এমন সুযোগ আমাদের আর একশত বৎসরের মধ্যে আসিবে না। এই সুযোগের আমরা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

‘বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফলে ভারতবর্ষের নৈতিক অবনতি, সংস্কৃতির বিনাশ, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক দাসত্ব মাত্র লাভ হইয়াছে।

আমাদের স্বাধীনতা আমাদের নিজেদের অর্জন করিতে হইবে। আমাদের চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের ফলে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিব আমাদের শক্তি বলেই তাহা রক্ষা করিব।

২২শে জুন ১৯৪৩:

ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রধান কার্য্যালয় ব্যাঙ্কক্ হইতে সিঙ্গাপুরে আসায় সুবিধা হইয়াছে অনেক।

সিঙ্গাপুরে জিনিষপত্রের দাম চড়িয়াছে অসম্ভবভাবে। এখানকার ডলার ভারতবর্ষের দেড় টাকার সমান। চাউল কাট্টি হিসাবে বিক্রয় হয়; ১ কাট্টি আমাদের এক পোয়ার কিছু বেশী (১ ১/৩ পাউণ্ড)। চাউলের দাম প্রতি পাউণ্ড আধ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৬০ টাকা মণ। শুনিতেছি আরও চড়িবে। অথচ বার্মায় চাউল রহিয়াছে প্রচুর এবং দামও খুব সস্তা। কাপড় প্রায় দুষ্প্রাপ্য। নারিকেলের দেশে একটা নারিকেল কিনিতে লাগে প্রায় এক টাকা! রোগ হইলে ঔষধ পাওয়া যায় না।

চাউল ও ময়দার পরিবর্ত্তে ট্যাপিওকা ও মিষ্ট আলু চলিতেছে। লোকে বাধ্য হইয়া তাহাই খাইতেছে। মাখনের অভাব—তিল বা নারিকেল তৈলও পাওয়া যাইতেছে না। রান্নার জন্য রেড্ পাম অয়েল ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে নাকি ভিটামিন্ এ আছে প্রচুর।

চাউল বা ময়দা কিছু যোগাড় করিতে হইবে।

২৪শে জুন ১৯৪৩:

আজ রেডিও শুনিলাম। টোকিও হইতে সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন—

‘আমি আমার বন্ধুগণকে আমার উপর বিশ্বাস রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সারা জীবন আমাকে অভিযুক্ত করিয়াছে এবং এগারো বার কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহারাও আমাকে বশীভূত করিতে পারে নাই। ধূর্ত্ত ও শক্তিমান ব্রিটিশই যখন আমাকে বশ করিতে বা দমাইতে পারে নাই, তখন পৃথিবীর অন্য কোন শক্তিও তাহা পারিবে না।

‘আমি জার্মাণী বা জাপানকে সমর্থন করিয়া কিছুই বলতে চাহি না। তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া কিছু বলা আমার কাজ নয়। ব্রিটেনের ভাড়াটিয়া প্রচারকেরা আমাকে শত্রুর চর বলিয়া অভিহিত করিতেছে। আমার সমগ্র জীবনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ও আপোষবিহীন সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস। চিরজীবন আমি ভারতের সেবক।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইবার সৌভাগ্য আমার দুইবার হইয়াছে। আমার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি ভারতবর্ষেরই সেবক থাকিব। পৃথিবীর যে অংশেই আমি বাস করি না কেন, একমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিই আমার আনুগত্য ও অনুরাগ এবং চিরদিনই থাকিবে।’

২রা জুলাই ১৯৪৩:

আজ শুনিলাম সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে আসিয়াছেন। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহার ব্যর্থতায় ভারতীয়গণের মনে এক হতাশার ভাব আসিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন এবং ভারতের অবিসংবাদিত নেতা; তাঁহার আগমনের সংবাদে সকলেরই মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইয়াছে—এবার হয়তো কিছু হইতে পারে।

৩রা জুলাই ১৯৪৩:

কাল ভারতীয় স্বাধীনতা সঙেঘর প্রতিনিধিগণের এক সভা সিঙ্গাপুরে হইবে। শ্যাম, জাভা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়াছেন। আমিও একখানি প্রতিনিধির কার্ড্ সংগ্রহ করিলাম।

আজ সকালে রাসবিহারী বসুর সহিত প্রতিনিধিদের ক্যাম্পে দেখা হইল। আমার সঙ্গী আলিম ভারতীয় স্বাধীনতা সঙেঘর পুরাতন কর্মী এবং রাসবিহারী বসুর সহিত পরিচিত। এই সুযোগে তাঁহার সহিত কথা বলিবার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করিলাম। তাহাদের কথার ফাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনি কি মনে করেন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে?'

তিনি বলিলেন-"নিশ্চয়ই হইবে।

আমার সঙ্গী বলিলেন —'আমরা আশা করি আপনার নেতৃত্বে ভারতবাসীর স্বপ্ন সফল হইবে।'

'আমার শরীর জরাগ্রস্ত—মনের উৎসাহের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে অক্ষম। অথচ এই কাজে প্রয়োজন এমন একজন কর্মীর যাহার মনে আছে অনন্ত উৎসাহ ও দেহে অদম্য কর্মক্ষমতা।'

'এমন লোক কোথায়?'

'আছে—সে সুভাষচন্দ্র বসু। আমার বিশ্বাস আছে তাহার উপর; সে-ই পারিবে। গত সম্মেলনে তাহার নাম আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম।'

এখানে আমি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম—

'একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, যদি কিছু মনে না করেন; লোকে বলে—

রাসবিহারী বসু হাসিয়া বলিলেন—বুঝিয়াছি। রাঘবনের সহিত গোলযোগ হইতে অনেকে ভুল বুঝিয়াছে। জাপানে বাস করিলেও ভুলিও না আমি ভারতবাসী; ভারতের জন্যই আজীবন নির্বাসন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি—যৌবনের সেই ব্যর্থ স্বপ্নকে সত্য করিবার আশায়।'

‘লোকে সেভাবে কিছু মনে করে না। সকলেই আপনাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভাবে আপনি জাপানীদের ভয় করিয়া চলেন।’

‘না—সেটা ভুল। দেশের মুক্তির জন্য বৃটিশকে ভয় করি নাই— আজ জাপানের বন্দুককেও ভয় করিব না।’

‘কিন্তু মোহন সিংএর সহিত জাপানীদের বিরোধের সময় আপনি বাধা দেন নাই।’

‘দেখ একটা জিনিষ দেখিতে হইবে; আমাদের না ছিল অর্থবল—না ছিল লোক বল। আমরা যে লড়াই করিব—কিসের জোরে?

‘জাপানীদের সাহায্য আমি ঘৃণা করি। কারণ আমি চাহি না প্রভুর পরিবর্ত্তন—বৃটিশের পরিবর্ত্তে জাপানী শাসন। এইজন্যই আমি প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভারতীয়দের একত্রিত করিয়া তাহাদের অর্থ ও সামর্থ্যে আমাদের মাতৃভূমিকে আমরা নিজেরাই যাহাতে স্বাধীন করিতে পারি তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। জাপানীরা ভারতের মাটিতে পদার্পণ করে, ইহা আমি চাহি না। কিন্তু ভারতের বাহিরে যে ৩০ লক্ষ ভারতবাসী আছে তাহাদের সংঠন জাপানীদের সহযোগিতা ব্যতীত হইবার উপায় নাই কারণ হাজার হাজার মাইল দূর হইতে ইহাদের একত্রিত করা অন্য উপায়ে সম্ভব নয়। যে সব ভারতীয় সৈনিক যুদ্ধবন্দী হইয়াছে তাহাদের লইয়া আমরা নিজেদের সেনাদল গঠন আরম্ভ করিয়াছি; জাপানীরা না দিলে, ইহাদের আমরা পাইতাম না। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া আমাদের এইসব করিতে হইয়াছে। জাপানীরা নিজেদের যুদ্ধ লইয়াই অতি ব্যস্ত; তাহার ফাঁকেই তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আমাদের কাজ করিয়া লইতে হইবে—ঝগড়া করিয়া নয়। আমরা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া উপযুক্ত সেনাদল গঠন করিতে পারি, আমরা নিজেরাই যুদ্ধ পরিচালনা করিতে পারিব।’

আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আমরা যদি জাপানীদের ভারতে যাইতে না দিই, তাহারা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিবে কেন?’

‘দিবে—কারণ গরজ তাহাদেরও আছে। জাপান আজ তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত দেশ অধিকার করিয়াছে। ভারতে যদি আমরা ইংরেজকে ব্যস্ত রাখিতে পারি, তাহা হইলে জাপান আমেরিকাকে ঠেকাইতে পারিবে।’

‘আপনি সুভাষচন্দ্রের উপর ভার দিবেন বলিলেন। আপনি কি আর থাকিবেন না?’

‘আমি থাকিব শুধু পরামর্শদাতা হিসাবে। আমাদের নেতার আদেশ পালনে উন্মুখ সৈনিক মাত্র থাকিতে চাই। আমার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে—স্বাধীন ভারতের মাটিতে শেষ নিশ্বাস ফেলিতে চাই—’

রাসবিহারী বসুর চোখের কোণে জল দেখিলাম। শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসিল।

৪ঠা জুলাই ১৯৪৩:

সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে আসিয়াছেন।

সুদুর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের যে সকল শাখা আছে, তাহাদের প্রতিনিধিগণের সভা আজ হইল। সভাস্থলে আমার পরিচিত মাত্র কয়েকজনকে দেখিলাম।

রাসবিহারী বসু বলিলেন—'আমি আজ ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতিত্বের ভার সুভাষচন্দ্র বসুর উপর দিতেছি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এই কার্য্যে প্রয়োজন এমন একজন নেতার যিনি জাতিকে জয়যাত্রার পথে লইয়া যাইতে পারিবেন। সুভাষচন্দ্র সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। আজ হইতে তিনিই আমাদের নেতা। নেতাজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিবে।'

জনতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিল।

সুভাষচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে বলিলেন—ভারতের বাহিরে যে ৩০ লক্ষ ভারতবাসী আছেন তাঁহারা যদি সংঘবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের চেষ্টায়ই ভারত স্বাধীন হইতে পারিবে। এই ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসীকে লইয়াই স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। তিনি ঘোষণা করিলেন—অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থা শীঘ্রই করা হইবে।

পরাধীন ভারতবাসীর নিজের গভর্ণমেন্ট—সকলের মনে এক নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। সভাস্থল পুনরায় নেতাজীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইল।

৫ই জুলাই ১৯৪৩:

আজ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এক বিরাট সেনা সমাবেশ এবং কুচ-কাওয়াজ হইল। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে যে বাহিনী গঠিত হইয়াছিল, দলাদলির ফলে তাহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। আজ সুভাষচন্দ্র নূতন করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠনের সংবাদ ঘোষণা করিলেন।

‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকগণ!

‘আজ আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গর্বের দিন। ভগবানের অসীম অনুগ্রহ যে আজ তিনি আমাকে জগতের সমক্ষে ভারতের মুক্তি সেনা গঠনের কথা প্রচার করিবার সুযোগ দিয়াছেন। যে সিঙ্গাপুর একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ছিল, সেইখানে আজ এই সেনাবাহিনী রণসজ্জায় দাঁড়াইয়া আছে। এই সেনাদলই ভারতকে ব্রিটিশ পাশ হইতে মুক্ত করিবে।

‘বন্ধুগণ, আমার সৈনিকগণ! তোমাদের সমর-ধ্বনি হইবে—দিল্লী চল, দিল্লী চল!

‘আমি জানি না, তোমাদের কতজন এই স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু আমি ইহা নিশ্চিত জানি যে আমরা শেষে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব। আমাদের মধ্যে যে সকল বীর বাঁচিয়া থাকিবেন, তাঁহারা দিল্লীর প্রাচীন লাল কেল্লায় বিজয় প্যারেড, না করা পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য শেষ হইবে না।

‘আমি বরাবর অনুভব করিয়াছি যে স্বাধীনতা লাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন আমাদের সবই আছে—নাই কেবল একটি জিনিষ—সেটি মুক্তিসেনা।

‘বন্ধুগণ! আজ তোমরাই ভারতের জাতীয় সম্মানের রক্ষক এবং ভারতের আশা আকাঙক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। সুতরাং তোমাদের আচরণ এবং কার্য্যকলাপ যেন এমন হয় যে তোমাদের স্বদেশবাসী তোমাদের আশীর্বাদ করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তোমাদের নামে গর্ব অনুভব করে।

আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে তোমাদের সুখে দুঃখে আনন্দে নিরানন্দে—অভাবে এবং জয়ে সকল অবস্থায়ই আমি তোমাদের মধ্যে থাকিব।

উপস্থিত আমি তোমাদের দিতে পারি কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণা, দুঃখকষ্ট পথশ্রম এবং মৃত্যু! আমাদের মধ্যে কে ভারতকে স্বাধীন দেখিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিব, তাহা আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের কাছে শুধু ইহাই যথেষ্ট যে ভারত স্বাধীন হইবে এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের যথাসর্ব্বস্ব আমরা দান করিব। ইহা অপেক্ষা বড় কামনা আমাদের আর নাই। ভগবান আমাদের সেনাবাহিনীকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা আগামী যুদ্ধে জয়লাভ করি।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের জাতীয় বাহিনী। ইহার নীতি, কার্য্যকলাপ এবং নেতৃত্ব—সমস্তই থাকিবে ভারতবাসীর হাতে। একজনও বিদেশী সৈন্যকে আমরা ভারতে প্রবেশ করিতে দিব না।

‘জাপানীরা ভারতকে স্বাধীন করিয়া দিবে, এরূপ ধারণা আমার নাই। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবে ভারতের জাতীয় বাহিনী; জাপানীদের আমরা ভারতবর্ষে যাইতে দিব না। যদি তাহারা আমাদের মতের বিরুদ্ধে যাইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদেরও আমরা আক্রমণকারী বলিয়া গণ্য করিব। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য—আমরাই তাহা করিব।’

ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ব্যতীত প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্য হইতেও সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে। তিনি এই বাহিনীর প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থের জন্য আবেদন করিলেন।

এইখানে ব্যানার্জ্জির সঙ্গে দেখা হইল। অনেক দিন পরে এই বিদেশে চেনা লোক দেখিয়া আনন্দ হইল।

ব্যানার্জ্জি বলিলেন—‘এবার সুভাষচন্দ্র নিজে সব ভার লইতেছেন। কাল তাঁহার সঙ্গে আমাদের কথা হইল।’

আমি বলিলাম—‘আপনার সঙ্গে তাঁহার আলাপ আছে কি?’

‘হাঁ, সামান্য পরিচয় ছিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের এক নির্ব্বাচনের সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম ও তাঁহার পার্টির জন্য খাটিয়াছিলাম।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘সুভাষচন্দ্র দলগঠন ও বক্তৃতা করিতে পারেন ভালো। আমি বোম্বে ও নাগপুরে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে যিনি নেতৃত্ব করিবেন, আধুনিক যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান থাকা দরকার হইবে না কি?’

ব্যানার্জি হাসিয়া বলিলেন—‘সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষ হইতে পলায়নের পর এতদিন জার্মানিতে ছিলেন। হিট্‌লার তাঁহাকে ইউরোপের রণাঙ্গনগুলি পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়াছিলেন। তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষে আর কাহারও নাই।’

সুভাষচন্দ্রের কলিকাতা হইতে পলায়নের কথায় আমার শিবাজীর পলায়নের কাহিনী মনে পড়িয়া গেল।

৯ই জুলাই ১৯৪৩:

আজ এক বিরাট জনসভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিলাম। সভাস্থলে অসংখ্য মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নেতাজী বলিলেন, কেন তিনি দেশত্যাগ করিয়াছেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্য হইতে স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্ভব নয়, তাই তিনি চাহেন বাহির হইতে সেই আন্দোলনকে সাহায্য করিবার জন্য। বাহিরের সাহায্য লওয়া উচিত কিনা, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—'সর্ব্বশক্তিশালী বৃটেন যদি আমেরিকার ও অন্য সকল শক্তির সাহায্য লইতে পারে আমরা কেন তাহা করিব না? বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যখন আমাকে ধ্বংস করিতে পারে নাই, তখন জাপানীরা বা অন্য কেহও পারিবে না। জটিল পরিস্থিতির প্রয়োজনে আমরা যদি বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করি তাহা দোষের হইবে না। একটা কথা উঠিতে পারে—মাত্র ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতবাসী কিরূপে ভারতকে স্বাধীন করিবে? কিন্তু আইরিশরা স্বাধীন হইয়াছিল মাত্র পাঁচ হাজার সশস্ত্র সিন্ ফিন্ স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে। সুতরাং আমরা ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতবাসী যদি ইচ্ছা করি স্বাধীনতা অর্জ্জনের আশা আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি।'

এই সভায় সুভাষচন্দ্র অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন করিলেন। মহিলা বাহিনী গঠনের কথাও আজ আমরা তাঁহার মুখে শুনিলাম।

১০ই জুলাই ১৯৪৩:

আজ সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের গতকল্যের সম্পূর্ণ বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে।

"আপনারা আজ আমাকে যে উৎসাহের সহিত অভিনন্দন জানাইয়া অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তাহার জন্য আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি। দেশত্যাগ করিয়া কেন আমি এই বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করিলাম তাহা আমি আজ আপনাদের বলিতে চাই।

আপনারা জানেন, ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ পার হইয়া উহার পরবর্ত্তী সকল স্বাধীনতা আন্দোলনেই আমি সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছি। গত কুড়ি বৎসরের সকল আইন-অমান্য আন্দোলনের সহিত আমার দৃঢ়সংযোগ ছিল। ইহা ব্যতীত, অহিংস অথবা সহিংস সকল প্রকার গোপন বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত থাকার সন্দেহক্রমে বহুবার আমাকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া বলিতে

পারি যে, আমি যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছি, ভারতে অন্য কোন জাতীয়তাবাদী নেতা সেরূপ অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন না।

এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্য হইতে আমরা যত তীব্র আন্দোলনই করিনা কেন। তাহা আমাদের দেশকে বৃটিশ প্রভুত্ব হইতে মুক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যকার সংগ্রামই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই নির্ব্বোধের ন্যায় বিনা প্রয়োজনে এই বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিতাম না।

আমি যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতেছে বাহির হইতে তাহাকে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত কাহারও পক্ষেই ভারতকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীন স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বহিঃসাহায্য অবিলম্বে প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে একান্ত অল্প। ইহার কারণ এই যে চক্র-শক্তির আঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় আসন টলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজেই সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

আমাদের দেশবাসীর দুই প্রকার সাহায্যের প্রযোজন—নৈতিক ও কায়িক। প্রথমত—তাহাদের অন্তরে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, একদিন তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করিবেই। দ্বিতীয়ত ভারতের বাহির হইতে তাহাদের সামরিক সাহায্য প্রদান করিতে হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের ফল কি তাহা বিচার করিতে হইবে। দ্বিতীয় আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে প্রবাসী ভারতীয়গণ মাতৃভূমিকে কি সাহায্য করিতে পারে এবং যদি প্রয়োজন হয় দেখিতে হইবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের নিকট হইতে কোন সাহায্য লাভ করা সম্ভব কিনা। বন্ধুগণ! আমি এখন বলিতে পারি, আমাদের এই দুটি উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়াছে। সুদূরবর্ত্তী মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আমি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং বিভিন্ন সমররত শক্তিগুলির অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। ইহার দ্বারা আমি যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে ইঙ্গ আমেরিকান সামাজ্যবাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখন আমি সে সংবাদ আমার মাতৃভূমিকে প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর আমি দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতীয়গণের মধ্যে এক তীব্র জাগরণের সাড়া আসিয়াছে

এবং তাহারা জাতীয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে বিশেষ ব্যগ্র। আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াও উৎসাহিত হইলাম যে চক্রশক্তি সত্যই ভারতকে স্বাধীন দেখিবার জন্য ব্যগ্র এবং ভারতীয়গণ আগ্রহ প্রকাশ করিলেই তাহারা তাহাদের শক্তি অনুযায়ী ভারতকে যে কোন সাহায্য করিতে প্রস্তুত। প্রবাসী ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে আমি বলিতে পারি যে, তাহাদের মধ্যে এরূপ এক ব্যক্তিও নাই যে ভারতের স্বাধীনতা চায় না এবং জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত নহে।

আমি আপনাদের কাছে শুধু এইটুকু চাই যে, আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন। আমার শত্রুও একথা বলিতে সাহসী হইবে না যে, আমি এরূপ কোন কার্য্য করিতে পারি যাহা আমার দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং যদি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আমাকে ধ্বংস করিতে না পারে, পৃথিবীতে অন্য কোন শক্তিই তাহা পারিবে না, আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন। যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারা বহিঃশক্তির সাহায্য চান, আমি বলিতেছি, চক্রশক্তি আপনাদের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবে। কিন্তু আপনারা সাহায্য চান কিংবা চান না। তাহা আপনারাই বিচার করিবেন এবং ইহা বলাই বাহুল্য যে, যদি সাহায্য ব্যতীতই সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হওয়া সম্ভব হয়, ভারতের পক্ষে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর হইবে। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিতে চাই যে, সর্ব্বশক্তিশালী বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র, এমন কি পরাধীন ভারতের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা জটিল পরিস্থিতির প্রয়োজনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিলে কিছুই অপরাধ করা হইবে না।

শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে আজ সমগ্র পৃথিবীর সম্মুখে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষনা করিবার দিন আসিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়গণ বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ, একটি সংগ্রামশীল বাহিনী গঠন করিতে যাইতেছে। এই বাহিনী ভারতস্থিত বৃটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হইবে। আমরা যখন আক্রমণ করিব, তখন ভারতের অভ্যন্তরেও বিপ্লব শুরু হইবে। এই আন্দোলন কেবলমাত্র বেসামরিক জনসাধারণই করিবে না, বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সৈনিকগণও বিদ্রোহ করিবে। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যখন অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইবে, তখন ইহা অচল হইয়া পড়িবে এবং ভারতীয় জনগণ সেই সময়ে পুনরায় তাহাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে।

সুতরাং আমি যে পরিকল্পনা করিয়াছি তাহার সম্বন্ধে জার্ম্মানী, ইটালী বা জাপান কিরূপ মনোভাব পোষণ করে—সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ চিন্তা

করিবার প্রয়োজন নাই। যদি কেবলমাত্র বিদেশস্থিত ও স্বদেশস্থিত ভারতীয়গণ তাহাদের কর্ত্তব্য করিয়া যায়, আমি বলিতেছি, তাহা হইলে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান নিশ্চয়ই হইবে।

সুবিধাবাদীরা বলিতে পারে যে, যদি ৩৮ কোটি ৮০ লক্ষ ভারতবাসী বৃটিশ শক্তিকে বহিষ্কৃত করিতে না পারে, তাহা হইলে কেবলমাত্র ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের দ্বারা ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? বন্ধুগণ, আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বৃটিশের অধীনস্থ ৩০ লক্ষ আয়ারবাসী সামরিক আইনের আওতায় থাকিয়াও কেবলমাত্র পাঁচ হাজার সশস্ত্র সিন্‌ফিন্‌ স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে ১৯২১ সালে বৃটিশ প্রভুত্বের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আজ ৩০ লক্ষ ভারতীয় মাতৃভূমিতে এক শক্তিশালী বিপ্লবের সাহায্য পাইয়া কেন বৃটিশ প্রভুত্বের কবল হইতে চিরতরে মুক্তি লাভের আশা করিতে পারে না?

আমি চাই, প্রবাসী ভারতীয়গণ, বিশেষ করিয়া এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ, এই কার্য্যে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে আমি একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট গঠন করিতে চাই এই গভর্ণমেন্ট প্রবাসী ভারতীয়গণকে সংহত করিবে এবং ভারতস্থিত বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিবে। যখন আমারা এই সংগ্রামে জয়লাভ করিব ও ভারত স্বাধীন হইবে, তখন এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গভর্ণমেন্টের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই গভর্ণমেন্ট ভারতের জনমতের দ্বারা গঠিত হইবে।

বন্ধুগণ, আপনারা কি আজ নিশ্চয়ই উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছেন যে ত্রিশলক্ষ প্রবাসী ভারতীয় যাহারা পূর্ব্ব এশিয়ায় বাস করিতেছে, তাহাদের পক্ষে আর্থিক ও জনশক্তি এবং অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার কেন্দ্রীভুত করিবার সময় আসিয়াছে। আমি সমগ্র ও সম্পূর্ণরূপে সংহত শক্তি চাই, ইহা অপেক্ষা কিছু কম নহে। কারণ আমরা বহুবার আমাদের শত্রুপক্ষের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, ইহা সামগ্রিক যুদ্ধ। আপনারা আজ আপনাদের সম্মুখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের এক অংশ—আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে দেখিতে পাইতেছেন। অন্য একদিন তাহারা তাহাদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ টাউন হলের সম্মুখে করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা স্থির করিয়াছে যে, ভারতের প্রাচীন নগরী দিল্লীর লাল কেল্লার সম্মুখে কুচকাওয়াজ করিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহারা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। দিল্লী চল, দিল্লী চল, ইহাই তাহারা শ্লোগান্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছে। বন্ধুগণ, পূর্ব্ব এশিয়ার ত্রিশলক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের এই চরম

যুদ্ধের জন্য চরম সংহতির শ্লোগান হউক—দিল্লী চল। আমি এই চরম সংহতির মধ্য হইতে কমপক্ষে ত্রিশলক্ষ সৈন্য ও নয় কোটী টাকা পাইতে আশা করি। আমি এতদ্ব্যতীত মৃত্যু-ভয়হীন বাহিনীর জন্য একদল সাহসী মহিলা চাই। একদা ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝান্সীর রাণী যে বীরত্বের সহিত তরবারি চলনা করিয়াছিলেন, এই নারী বাহিনীকেও সেইরূপ বীরত্বের পরিচয় দিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আমরা অনেক দিন ধরিয়া ইউরোপের দ্বিতীয় ফ্রন্টের কথা শুনিতেছি। আমাদের স্বদেশবাসী বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট দাবী করে। আমাকে পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত সংঘবদ্ধ শক্তি দান করুন। আমি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিতীয় ফ্রন্‌ট্ সৃষ্টি করিতে চাহি।”

২৫শে আগষ্ট ১৯৪৩

আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সর্ব্বময় কত্‌র্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে সিপা সালার নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে।

সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করিয়া তিনি এক ঘোষণা করিয়াছেন। রেডিওতে সেই ঘোষণা শুনিলাম।

‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে আজ আমি আমাদের সৈন্যদের প্রত্যক্ষ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলাম। আমার পক্ষে ইহা আনন্দ ও গৌরবের বিষয়। ভারতের মুক্তিসেনার সেনাপতি হইবার অপেক্ষা বড় কোন সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে থাকিতে পারে না।

যে কার্য্যভার আমি গ্রহণ করিলাম তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন আছি। অবস্থা যতই কঠোর হউক না কেন, আপদে বিপদে সকল অবস্থায় কর্ত্তব্য সাধনের ক্ষমতা ভগবান যেন আমাকে দেন।

আমি নিজেকে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ৩৮ কোটি ভাবতবাসীর সেবক বলিয়া মনে করি। আমার কর্ত্তব্য আমি এমনভাবে পালন করিব যাহাতে এই ৩৮ কোটি নরনারীর স্বার্থ আমার হাতে নিরাপদ থাকে এবং মাতৃভূমির অসন্ন মুক্তিসংগ্রামে স্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও ভারতের স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থায়ী সৈন্যদল গঠনে প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারেন। অবিমিশ্র জাতীয়তাবাদ, ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের মুক্তি সেনা গঠিত হইতে পারে।

ভারতমাতার মুক্তির জন্য আসন্ন সংগ্রামে, ৩৮ কোটি ভারতীয়ের শুভেচ্ছাভাজন গভর্ণমেন্ট গঠনে এবং ভারতের স্বাধীনতা চিরদিন রক্ষার জন্য একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে। আমরা যে সেনা বাহিনী গঠন করিব তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে ভারতের স্বাধীনতা—ভারতের মুক্তির জন্য মন্ত্রের সাধন, কিংবা মৃত্যুবরণ। আমরা যখন দাঁড়াইব, দাঁড়াইব প্রস্তরের প্রাচীরের ন্যায়; আর যখন অগ্রসর হইব, তখন চলিব ষ্টিম রোলারের ন্যায়।

আমাদের দায়িত্ব খুব সহজ নয়। যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিবে এবং খুবই কঠোর হইবে। আমাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও দুর্ভেদ্যতার প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রহিয়াছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ৩৮ কোটি মানবের স্বাধীন হইবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে এবং স্বাধীনতার মূল্য দিতে তাহারা প্রস্তুত। আমাদের স্বাধীনতায় জন্মগত অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই।

সহকর্মিগণ, অফিসার ও সৈনিকগণ! আপনাদের অকপট সমর্থন ও অনমনীয় অনুগত্যের দ্বারা আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তির যন্ত্রস্বরূপ হইবে। চূড়ান্ত জয় আমাদের হইবেই। আপনার বিশ্বাস করিতে পারেন যে আমাদের কার্য্য ইহার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে।

আসুন, আমরা ‘দিল্লী চলো’—এই ধ্বনি উত্থিত করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করি। যতদিন নূতন দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাকা না উড়ে-যতদিন ভারতের রাজধানীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজ তাহার বিজয় উৎসব না করে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সংগ্রামের বিরতি যেন না হয়।”

২১শে অক্টোবর ১৯৪৩:

আজ সকালে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক বিরাট সভা ক্যাথে বিল্‌ডিং-এ হইবে এবং তাহাতে সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য ভারতীয় নেতা যোগদান করিলেন। সিঙ্গাপুরের ভারতীয়গণের মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে এবং সভা আরম্ভের অনেক পুর্বে ই সভাস্থল সিঙ্গাপুরের ভারতীয় অধিবাসী এবং ভারতীয় সৈনিকে পূর্ণ হইয়া গেল। সুদূর ইন্দোচীন, হংকং, শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৭৮ হাজার লোক হইয়াছিল। ঠিক ১০-৩০ টায় সভা আরম্ভ হইল।

প্রথমে কর্ণেল চাটার্জি বলিলেন। তারপর বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে উঠিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি হিন্দীতে বলিলেন—স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রগঠনের কথা। জনতা মন্ত্রযুদ্ধের ন্যায় তাঁহার বক্‌তৃতা শুনিল।

তিনি বলিলেন—আমাদের স্বাধীনতা আসন্ন। প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য একটি জাতীয় গভর্ণমেন্ট স্থাপন এবং সেই গভর্ণমেন্টের নেতৃত্বে দেশকে মুক্ত করা। আজ ভারতে জনসাধারণ নিরস্ত্র এবং নেতারা কারাগারে বন্দী; সুতরাং ভারতে ইহা সম্ভব নয়। আজ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসীবৃন্দ তাই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট গঠন করিয়াছেন দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য।

নবগঠিত আজাদ হিন্দ্‌ গভর্ণমেন্টের মন্ত্রীদের নাম ঘোষণার পর সুভাষচন্দ্র শপথ গ্রহণের জন্য উঠিলেন। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি শপথ পাঠ করিতে লাগিলেন।

‘আমি ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে আমি আমার জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এবং আমার ৩৮ কোটি স্বদেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিব।

এইখানে ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। স্থিরভাবে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় মাইক্রোফনের সম্মুখে দণ্ডায়মান স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক সেই মূর্ত্তির স্মৃতি আজীবন আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। জনতা নিস্তব্ধ।

তারপর আবার তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

‘আমি আজীবন ভারতের সেবা করিব এবং আমার ৩৮ কোটি ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিব। ইহাই হইবে আমার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।”

জনতা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে চীৎকার করিল—‘সুভাষচন্দ্র বসু কি জয়’—‘আজি হুকুমৎ আজাদ হিন্দ কি জয়’।

সুভাষচন্দ্রের পর তাঁহার মন্ত্রীগণ একে একে শপথ গ্রহণ করিলেন। জনতা তাঁহাদের সঙ্গে বলিল—

‘ভগবানের নামে শপথ করিতেছি আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এবং আমার ৩৮ কোটি স্বদেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিব।’

*   *   *   *   *

আজ বৈকালে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের ঘোষণাপত্র দেখিলাম। ঘোষণার নীচে সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রীদের নাম।

"ভারতের স্বাধীনতা আজ আসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য হইল একটি অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট্ গঠন করিয়া তাহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া স্বাধীনতার সগ্রাম করা। কিন্তু ভারতের নেতাগণ আজ কারাগারের অন্তরালে বন্দী এবং জনসাধারণও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ অবস্থায় ভারতে সাময়িক গভর্ণমেন্ট গঠন বা সেই গভর্ণমেন্টের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা সম্ভব নয়। এইজন্য পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্ত্তব্য হইল—স্বদেশ ও বিদেশের সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সমর্থন লইয়া ভারতের অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠন করিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করা।

অস্থায়ী গভর্ণমেন্টকে ভারত হইতে বৃটিশ ও তাহার মিত্রদের বিতাড়িত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট স্বাধীন ভারতের জনগণের ইচ্ছানুসারে এবং তাহাদের বিশ্বাসভাজন একটি স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠন করিবেন। ব্রিটিশ ও তাহার মিত্রদের বিতাড়িত করিবার পর স্বাধীন ভারতে স্থায়ী জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠিত হওয়া পর্য্যন্ত এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট দেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

১৭৫৭ সালে বাংলা দেশে ব্রিটিশের নিকট প্রথম পরাজয়ের পর ভারতবর্ষের জনগণ এক শত বৎসর ধরিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিরামহীন প্রচণ্ড সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন। এই এক শত বৎসরের ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্তে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলা, বাঙলার মোহনলাল, হায়দার আলী, টীপু সুলতান, দক্ষিণ ভারতের ভেলু তাম্পী, আপ্পা সাহেব ভোঁস্‌লে, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বাজী রাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আত্রিওয়ন্, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাই, আঁতিয়া টোপি, দুমরাওনের মহারাজ কুন্ওয়ার সিং, নানা সাহেব এবং আরও বহু বীরের গৌরবপূর্ণ নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

আপনাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে ব্রিটিশ সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই তাঁহারা সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে কখনো দণ্ডায়মান হন নাই। তারপর

শেষে যখন তাঁহারা ব্রিটিশের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহারা সম্মিলিত হইলেন। ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শাহের নেতৃত্বে তাঁহারা স্বাধীন জাতি হিসাবে শেষ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে কয়েকটি জয়লাভ করাও সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য এবং ত্রুটিপূর্ণ নেতৃত্বের ফলে তাঁহাদের পরাজয় এবং দেশের পরাধীনতা উপস্থিত হইল। তথাপি ঝান্সীর রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুন্‌ওয়ার্ সিং এবং নানা সাহেব জাতির গগনে চিরন্তন নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান থাকিয়া আমাদিগকে অকুণ্ঠিত আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার প্রেরণা দিতেছেন।

ইহার পর ব্রিটিশ সবলে ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করিয়া দিল। ভারতের জনগণ কিছুকাল হতাশ ও হতবাক হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মের পর ভারতবাসীর অন্তরে নব জাগরণের বন্যা জাগিল। ১৮৮৫ হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতবাসী তাহাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আন্দোলন, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন প্রভৃতি এবং শেষে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ পর্য্যন্ত ধরিয়াছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। পরিশেষে ১৯২০ সালে ব্যর্থতার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হইয়া ভারতবাসী যখন নূতন পথের সন্ধান করিতেছিল, তখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগিতা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নুতন অস্ত্র লইয়া ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।

ইহার পর বিশ বৎসর চলিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে ভারতবাসীগণ নানা প্রকার দেশপ্রেমমূলক কার্য্য করিয়াছে। মুক্তির অমোঘ বাণী ভারতের প্রতিগৃহে পৌঁছিল। দেশবাসী স্বাধীনতার জন্য নির্য্যাতন ও কারাবরণ করিতে শিখিল, আত্মত্যাগ করিতে শিখিল এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে শিখিল। কেন্দ্র হইতে সুদূর পল্লী পর্য্যন্ত জনগণ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সঙঘবদ্ধ হইল। এইভাবে ভারত শুধু রাজনৈতিক চেতনাই লাভ করিল না, তাহারা একটি অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হইল। ইহার পর তাহারা এক স্বরে কথা বলিতে পারিল এবং একই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের জন্য এক মনে সংগ্রাম করিতে শিখিল। ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন ও দক্ষতাপূর্ণ কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিল যে, ভারতবাসী নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের ভূমি প্রস্তুত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্মাণী তাহার মিত্রদের সহায়তায় ইউরোপে আমাদের শত্রুদের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানিয়াছে। এদিকে জাপানও পূর্ব এশিয়ায়

আমাদের শত্রুর উপর প্রবল আঘাত করে। বিভিন্ন অবস্থার অনুকূল সমন্বয়ের ফলে ভারতের জনগণ জাতীয় মুক্তি অর্জ্জনের এক অভূতপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিয়াছে।

ভারতের ইতিহাসে আর একটি নুতন ঘটনা এই যে, বিদেশে অবস্থিত ভারতীয়গণের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়াছে এবং তাঁহারাও একটি প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা শুধু স্বদেশবাসীর সহিত সমানভাবে চিন্তা করিতেছেন না, স্বাধীনতার পথে তাঁহারাও স্বদেশবাসীর সহিত একতালে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব এশিয়ায় আজ ত্রিশ লক্ষের অধিক ভারতবাসী এক সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা আজ পূর্ণ সমরায়োজনে অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছে ভারতের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ এবং তাঁহাদের মুখে কেবল একটিমাত্র কথা—'দিল্লী চলো'।

আজ ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় ভারতবাসীর শুভেচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আজ তাহারা এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে। এই অপ্রীতিকর শাসনের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য প্রয়োজন শুধু একটি মাত্র অগ্নিস্‌ফুলিঙ্গের। সেই অগ্নিস্‌ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিবার ভার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উপর। স্বদেশের অসামরিক জনগণের ও ব্রিটিশ সরকার গঠিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু লোকের বিপুল সমর্থনে এবং বিদেশে আমাদের অজেয় মিত্রবর্গের সহায়তায় ও আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আজাদ্ হিন্দ ফৌজ তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা সফলতার সহিত অভিনয় করিবে বলিয়া বিশ্বাস করে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ) এক্ষণে পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দের অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন আমরা পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানের সহিত কর্ত্তব্যে অবতীর্ণ হইতেছি। ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা, আমাদের কার্য্য ও মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের উপর তাঁহার অনাবিল আশীর্ব্বাদ ধারা বর্ষিত হউক। আজ আমরা দেশের মুক্তির জন্য, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য এবং জগতের সমক্ষে আমাদের মাতৃভূমিকে উন্নত করিবার জন্য আমাদের জীবন পণ করিতেছি।

এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট হইতে আনুগত্য দাবী করিতেছে এবং আনুগত্য লাভের অধিকার ইহার আছে। এই গভর্ণমেন্ট ধর্ম্মগত স্বাধীনতা এবং সকল দেশবাসীর সমান অধিকার ও সুযোগ ও সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দিতেছে। ইহা আরও ঘোষণা করিতেছে যে ব্রিটিশের

সৃষ্ট সকলপ্রকার বিভেদ উচ্ছেদ করিয়া ইহা সমগ্র দেশের সমস্ত অংশের সুখ সমৃদ্ধি বিধানের পথে সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভগবানের নামে এবং অতীতে যাঁহারা ভারতীয় জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নামে, এবং পরলোকগত যে সকল শহীদ আমাদের সম্মুখে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নামে—আজ আমরা ভারতীয় জন সাধারণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হইতে এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করিতেছি। ব্রিটিশ এবং তাহার মিত্রদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্য আমরা তাঁহাদের আহ্বান করিতেছি। শত্রু যতদিন না ভারতভুমি হইতে চিরতরে বহিষ্কৃত হয় এবং যতদিন না ভারতবাসী আবার স্বাধীন হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা এই সংগ্রাম সাহস, অধ্যবসায় এবং চরম জয়ে বিশ্বাসের সহিত চালাইয়া যাইব।'

আজাদ হিন্দ সামরিক গভর্ণমেন্টের পক্ষে—

সুভাষচন্দ্র বসু

(রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র সচিব)

কাপ্তেন মিসেস্ লক্ষ্মী

(নারী সংগঠন)

এস্. এ. আয়ার

(প্রচার)

লে. কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জ্জি

(অর্থ বিভাগ)

লে. কর্ণেল আজিজ আহম্মদ

লে. কর্ণেল এল্ এস্ ভগৎ

লে. কর্ণেল জে কে ভোঁসলে

লে. কর্ণেল গুলজারা সিং

লে. কর্ণেল এম্ জেড্ কিয়ানি

লে. কর্ণেল এ. ডি. লোকনাথন্

লে. কর্ণেল এহ্সান্ কাদির

(সৈন্য বাহিনীর প্রতিনিধি)

এ. এম্ সহায়

(মন্ত্রীর পদমর্য্যাদাসম্পন্ন সেক্রেটারি)

রাসবিহারী বসু

(প্রধান পরামর্শদাতা)

করিম গণি

দেবনাথ দাস

ডি. এম্ খাঁ

এ ইয়েলাপ্পা

জে. থিবি

সর্দ্দার ঈশ্বর সিং

(পরামর্শদাতাগণ)

এ. এন্ সরকার

(আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা)

২২শে অক্টোবর ১৯৪৩:

এতদিন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ বা আজাদ হিন্দ সঙঘ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু কোন সভা বা সমিতি দ্বারা এইরূপ একটি বিরাট কাজ সম্ভব হইতে পারে না। সমিতির কতৃর্পক্ষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের মধ্যে মনান্তরের ফলে কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নেতাজীর পরামর্শে আজাদ্ হিন্দ গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হওয়ায় এই সমস্যার সমাধান হইল। সেনাদল গভর্ণমেন্টের অধীন হইল।

ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগও রহিল প্রবাসী ভারতবাসীগণের একটি সভারূপে। ইহার কাজ হইল ফৌজের জন্য লোক ও অর্থ সংগ্রহ এবং সমাজসেবা।

নেতাজী এই সঙেঘরও সভাপিত হইয়াছেন। তিনি একাধারে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের নেতা, ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক এবং লীগের সভাপতি।

আজাদ হিন্দ সঙেঘর প্রধান কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে থাকিবে। জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, ব্রহ্ম, শ্যাম, ইন্দোচীন, চীন, মাঞ্চুকুয়ো, জাপান প্রভৃতি যেখানে ভারতবাসী আছে, সেইখানেই সঙেঘর শাখা আছে।

সঙেঘর প্রত্যেক শাখায় এই কয়টি বিভাগের ব্যবস্থা হইয়াছে:

(ক) সভ্য সংগ্রহ বিভাগ: সেনাবিভাগে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টাও এই বিভাগ করিবে।

(খ) অর্থ সংগ্রহ বিভাগ: প্রবাসী ভারতবাসীগণের নিকট হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থার ভার এই বিভাগের উপর।

(গ) প্রচার বিভাগ।

(ঘ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ।

(ঙ) সমাজমঙ্গল বিভাগ: দুর্গত ভারতবাসীদের সাহায্য, প্রভৃতি কাজ এই বিভাগ হইতে করা হইবে।

(চ) মহিলা বিভাগ।

(ছ) রাজনৈতিক বিভাগ: এই বিভাগ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

প্রত্যেক বিভাগের একজন করিয়া সম্পাদক থাকিবেন।

আজাদ হিন্দ গেজেট প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্পাদনা করিবেন আর্ এস্ রাওয়াল্।

২৩শে অক্টোবর ১৯৪৩:

আজ ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। জাপান গভর্ণমেন্ট নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়াছেন। ঘোষণায় বলা হইয়াছে—‘জাপানী গভর্ণমেন্ট অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিতেছেন এবং এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে ইহার উদ্দেশ্যের সাফল্যের জন্য সকল প্রকার সম্ভবপর সাহায্য করিবেন।’

আজ আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

টোকিও মিলিটারী একাডেমীতে সমর বিদ্যা শিক্ষার জন্য একদল শিক্ষার্থী লওয়া হইবে বলিয়া নেতাজীর স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি আজ প্রকাশিত হইয়াছে। দেখি — যদি আমি যাইতে পারি।

২৫শে অক্টোবর ১৯৪৩:

আজ মালয় ও সিঙ্গাপুরের ভারতীয় বণিকদের এক সভা হইল। রাওএর সঙ্গে আমি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে গেলাম।

সুভাষচন্দ্র বলিলেন—‘যুদ্ধের সময় দেশের সমগ্র ধন-সম্পত্তি এবং নরনারীর উপর দেশ ও জাতির দাবি অগ্রগণ্য। দেশের সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে বৃটেন, জার্ম্মাণি, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে জাতির সমস্ত সম্পদ, কল-কারখানা, শিল্প ও বাড়ীঘর যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জনসাধারণ স্বেচ্ছায় অর্থদান করিতেছে এবং তাহাদের আয়ের প্রায় সবটাই দিতেছে আয়কর হিসাবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রয়োজন সৈন্যদল ও আধুনিক রণসম্ভার—এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান। ইহার জন্য আবশ্যক প্রচুর অর্থের। আমরা যদি আজ জাপানের কাছে অর্থ চাহি—তাহারা দিবে; কিন্তু তাহার বিনিময়ে হয়তো আমাদের তাহাদের কবলে পড়িতে হইবে। ইহা আমি চাহি না। আমরা যতদূর সম্ভব নিজেদের চেষ্টায় আমাদের স্বাধীনতা আনিব। বিদেশীর সাহায্য যতটা অযাচিতভাবে পাই লইতে বাধা নাই; কিন্তু আমাদের নিজেদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠনের ফলে জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে আপনারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বেশী সুবিধা ভোগ করিতেছেন এবং অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট আপনাদের ধনসম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আমি আশা করি আপনাদের অর্থের শতকরা দশ ভাগ মাত্র আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টকে দান করিবেন।’

সভার শেষে নেতাজীর গলার মালা এক লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইল। আশা হইতেছে অনেক টাকা উঠিবে। এই অঞ্চলের ভারতবাসীদের যে এত টাকা আছে তাহা আমার ধারণা ছিল না।

২৬শে অক্টোবর ১৯৪৩:

জানকী দেবীর সহিত আলাপ ছিল না—আজ হইল। সুন্দরী না হইলেও—চেহারায় চটক্ আছে। দেহের কমনীয় রেখাগুলিতে স্বাস্থ্যের বলিষ্ঠতা। উজ্জ্বল টানা টানা চোখ—মাথায় বব্-করা কোঁকড়া কালো চুল। ধব্‌ধবে ফর্শা রঙ। পরণে ফুল্ প্যান্ট, খাকি সার্ট্ আর মাথায় টুপি বাঁকাভাবে পরা।

ব্যানার্জির বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। চায়ের কাপের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। তাহার ফাঁকে জানকী দেবীকে দেখিয়া লইলাম। ফয়া সুন্দরী; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব আছে। জানকী দেবী যেন তাহার অপেক্ষা সুন্দরী।

তাহার চটুল হাসি ও গল্পের মধ্য দিয়া কখন যে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছে বুঝিতে পারি নাই।

জানকী দেবীর স্বামী গত বৎসর মারা গিয়াছেন। তিনি একটি অফিসে কাজ করিতেন; এখন ঝাঁসীর রাণী বাহিনীতে যোগ দিয়াছেন।

জানকী দেবীর কাছে তাঁহাদের নারী বাহিনীর গল্প শুনিলাম। লক্ষ্মী স্বামীনাথন্ নামে এক মাদ্রাজী মহিলা ডাক্তার ইহার অধিনায়িকা হইয়াছেন। ইনি মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার; মাত্র তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৯৪০) সিঙ্গাপুরে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। নারী বাহিনী গঠনের ভার নেতাজী তাঁহার উপরে দিয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনাদের কি যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে?'

'হাঁ, আমরা যুদ্ধ করিতেও শিখিব।'

'আপনারা তাহা হইলে যুদ্ধ করিবেন।'

'আহত সৈন্যদের সেবাই হইবে আমাদের প্রধান কাজ এবং আমরা নার্সিং শিখিতেছি। তবে প্রয়োজন হইলে আমরাও বন্দুক লইয়া আপনাদের পাশে দাঁড়াইতে পারিব।'

ব্যানার্জ্জি বলিলেন—‘ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে বেশী লোক পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।’

‘আপনার ধারণা ভুল। ইহার মধ্যেই আমাদের সংখ্যা দেড় শত হইয়াছে। আপনাদের বাঙালী মেয়েও আছে ইহার মধ্যে। বেলা দত্ত, মিস্ ভট্টাচার্য্য, মায়া গাঙ্গুলী, রেবা সেন, সিপ্রা সেন এবং আরও কয়েকজন যাহাদের নাম আমি জানি না।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘আপনারা কোথায় শেখেন?’

‘আমাদের জন্য সিঙ্গাপুরে একটি মেয়েদের সামরিক বিদ্যালয় হইয়াছে; সেইখানে আমরা শিখি। ২২শে উদ্বোধন হয়। নেতাজী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা কি আপনারা খবরের কাগজে দেখেন নাই?’

‘আমি বলিলাম—‘নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পাই না।’

জানকী দেবীর পকেটে সেই অংশটুকু পত্রিকা হইতে কাটা ছিল। আমি তাহা চাহিয়া লইলাম। নেতাজী বলিয়াছিলেন:

‘ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঘটনা—পূর্ব্ব এশিয়ায় আমাদের সংগ্রামের অগ্রগতির পথে একটি স্মরণীয় কাহিনী। ইহার সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদের অন্তরের সজল অনুভূতি দিয়া মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের এই আন্দোলন শুধু রাজনীতিক আন্দোলন নয়। আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে নুতন করিয়া নব আদর্শে গড়িয়া তুলিবার মহান্ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ভারতের জন্য আমরা এক নবযুগ আনিব; আমাদের নব জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিব। আপনার মনে রাখিবেন—ইহা মাত্র ফাঁকা কথা নয়। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভারতের পুনর্জীবন আসন্ন। ভারতীয় নারীদের মধ্যেও এই নব জাগরণের শিহরণ উঠা স্বাভাবিক।

আজ যে শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হইল, তাহাতে আমাদের ১৫৬ জন ভগ্নী শিক্ষালাভ করিবেন। আমি মনে প্রাণে আশা করি, সিঙ্গাপুরে শীঘ্রই তাঁহাদের সংখ্যা এক হাজার হইবে। থাইল্যাণ্ডে এবং ব্রহ্মদেশেও নারী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হইল সিঙ্গাপুরে।

আমার একান্ত বিশ্বাস, এক হাজার ‘ঝাঁসীর রাণী’ এই কেন্দ্র হইতে উঠিবেন।’

২৭শে অক্টোবর ১৯৪৩:

আজ সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি সভা হইল। সত্যের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৪০।৫০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ব্যানার্জি আমাকে সুভাষচন্দ্রের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

আজাদ হিন্দ্ বাহিনী লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের ব্যবস্থা হইবে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুভাষচন্দ্র জানিতে চাহেন। তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেন ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে; তাহার পর যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা খুবই সামান্য এবং সেন্সরের ফলে বিকৃত।

ব্যানার্জি ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমেই কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন ফিরিয়াছেন। তিনি বলিলেন—‘আমি যখন ছিলাম সেই সময় বাংলা দেশে নেতাজীর সমর্থক কংগ্রেস দল ও শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা একত্রে এসেম্ব্লিতে কাজ করিতেছিলেন।’

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে মহাত্মাজী এবং কমিউনিষ্ট্ দলের মতামত সম্বন্ধে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্যানার্জি বলিলেন—“কমিউনিষ্ট্রা রাসবিহারী বাবু এবং নেতাজীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে।”

ব্যানার্জি এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তিনি ডিসেম্বর মাসে বার্মায় ফিরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বিশেষ সুপারিশ ভিন্ন জাহাজে বা এরোপ্লেনে স্থান লাভ অসম্ভব ছিল। এই সম্পর্কে একজন বন্ধু তাঁহাকে হিন্দু মহাসভার নেতা ডাক্তার সন্তোষকুমার মুখার্জির নিকট লইয়া যান। সেই সময় তাঁহার সহিত একজন কমিউনিষ্ট্ ছাত্র দেখা করিতে গিয়াছিল এবং নেতাজীকে বলিয়াছিল—কুইস্লিং।

ইহার উত্তরে সন্তোষবাবু তাহাকে বলেন—“কুইস্লিং নিজের স্বাধীন মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। আমরা স্বাধীন নই। সুতরাং কুইস্লিং-এর সহিত সুভাষচন্দ্রের তুলনা করা অন্যায়। সুভাষচন্দ্রের ন্যায় দেশপ্রেমিক বিরল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগও যে একটি বড় অস্ত্র তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মহাত্মা, সুভাষচন্দ্র ও সাভারকর প্রভৃতি বিভিন্ন দিক হইতে চেষ্টা করিতেছেন। পথ ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য একই—ভারতের মুক্তি।”

ব্যানার্জি কলিকাতায় কমিউনিষ্ট্দের একদিনের সভার কৌতুকজনক বর্ণনা দিলেন। ইহাদের শ্লোগান্—'জাপানকে রুখ্তে হবে'—'রুশকা লড়াই, হামারা লড়াই'। তাহাদের একটি গানের কথাগুলি ব্যানার্জি বলিলেন:

'কমরেড্, ধরো আজ হাতিয়ার!
দুনিয়ার জনগণ সাথে চল সবাকার।
কমরেড্, ধরো আজ হাতিয়ার।
যুদ্ধ—মুক্তি ও শৃঙ্খলে;
ফ্যাসিবাদ যাক্ আজ্ অতলে।
কমরেড্, হও আজ হুঁসিয়ার।'

[গানটি ব্যানার্জির নিকট হইতে সভার পরে লিখিয়া লইলাম। ইচ্ছা আই-এন-এর জন্য এই ধরণের একটি হিন্দী গান রচনা করিব।]

কমিউনিষ্টরা পূর্ব্বে যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে বলিত—'এটা সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ'। রাশিয়া যুদ্ধে যোগদানের পরেই তাহাদের বুলির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তাহারা বলিতেছে—'এই যুদ্ধ ফ্যাসিষ্ট বনাম গণতন্ত্রের যুদ্ধ— পরাধীনতার বিপক্ষে স্বাধীনতার সংগ্রাম। সোভিয়েট্ রাশিয়া, চীন, বৃটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সকলকে লড়িতে হইবে।' জনসাধারণের ধারণা ইহারা সরকারী অর্থসাহায্য পায়।

শরৎচন্দ্র বসুকে ১৯৪১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে অন্তরীণ করা হইয়াছে।'

ব্যানার্জির সংবাদ প্রায় এক বৎসরের পুরাতন।

এই সময় জানা গেল, এক জন একমাস পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়াছেন। জাপানীরা তাঁহাকে সব্মেরিণে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

তাঁহার নিকট ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখের কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাবগুলি এবং মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনের বর্ণনা শুনিলাম। তিনি দাবি করেন—বৃটিশকে ভারতের সকল ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং কেবল ভারতরক্ষা ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেইরূপ ক্ষমতা তাহারা রাখিতে পারিবেন। তারপর ১৯৪২

সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেস কমিটি অধিবেশনের পর মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য সকল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। কিন্তু "ভারত ছাড়" এই বাণী দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। স্বতঃস্ফূর্তরূপে এক আন্দোলন সমগ্র দেশের উপর দিয়া ঝড়ের মত বহিয়া গেল। গভর্ণমেন্ট এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হইল। মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থান এবং বিহার ও যুক্ত প্রদেশের অনেক স্থানে সাময়িকভাবে বৃটিশ শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। নেতৃত্ববিহীন সেই জন-আন্দোলন সংগঠনের অভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। বাংলার দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক মরিতেছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জন মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নেতাজীর বেতার বক্তৃতা ভারতে সকলেই আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকে।

তিনি বলিলেন যে তাঁহাকে খুব সাবধানে চলিতে হইয়াছিল, এজন্য কোন বিশিষ্ট লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয় নাই।

৭ই নভেম্বর ১৯৪৩:

আজ টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের অধিবেশন হইতেছে টোকিওতে। এই সুযোগ টোকিও বেড়ানো হইবে ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা আর হইল না। মধু অভাবে গুড়েই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল— রেডিওতে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর বক্তৃতা শোনা গেল। তিনি বলিলেন:

‘অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতের দেশপ্রেমিকগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প; সুতরাং আমি এই সুযোগে ঘোষণা করিতেছি যে জাপ গভর্ণমেন্ট জাপ বাহিনীর অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শীঘ্রই আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান যে সহায়তা করতে উদ্‌গ্রীব ইহা তাহার প্রথম প্রমাণ। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে জাপান সর্ব্বতোভাবে সহযগিতা করিতে প্রস্তুত; জাপান চাহে যে ভারতীয়েরাও এই কার্য্য সাধনের জন্য তাহাদের চেষ্টা দ্বিগুণ করিবে।’

রেডিও শুনিতেছি; এমন সময় জানকী দেবী আসিয়া উপস্থিত। আজ আর মিলিটারি সাজ নয়। চাঁপা রঙের শাড়ী স্কার্টের মতন করিয়া পরা— ফিকে নীল রঙের ব্লাউজ। কাপড়ের রঙের সঙ্গে গায়ের রঙ্ মিলিয়া গিয়াছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম-‘নমস্তে’।

‘একলাটি বসিয়া রেডিও শুনিতেছেন। আসুন, একটু বেড়াইয়া আসি।’

ব্ল্যাক্ আউটের অন্ধকার রাস্তায়। ভূতের বাড়ীর মত সারি সারি বাড়ীগুলি অন্ধকারের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক একটা আলোক চোখে ঠুলি পরিয়া ঝিমাইতেছে। দুইজনে চলিতেছি গল্প করিতে করিতে।

হঠাৎ জানকী দেবীর পায়ে কিসের জন্য হোঁচট্ লাগিল। আমি ধরিয়া ফেলিলাম।

জানকী দেবী বলিলেন—‘আর একটু হইলে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতাম। যেরূপ অন্ধকার—একা চলা কঠিন।’

আমার হাতের মধ্যে জানকী দেবীর বাহু ছিল। সেইভাবেই চলিলাম। জানকী দেবীর দিক হইতেও সরাইয়া লইবার কোন চেষ্টা হইল না।

পার্কে গিয়া দুজনে বসিলাম। কতক্ষণ গল্প করিয়াছি জানি না। অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের অগণিত তারা আসিয়া নামিয়াছে দূরে সমুদ্রের বুকে স্নান করিবার জন্য। নক্ষত্রমালার মধ্যমণি চাঁদের মতোই জানকীর মুখখানি। তাহার গায়ের নিবিড় স্পর্শ রক্তের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

৩০শে নভেম্বর ১৯৪৩:

আজ আমি রিক্রুট্‌মেন্ট অফিসে। অনেক লোক আসিতেছে সৈন্যদলে যোগদানের জন্য। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রত্যেক সৈনিককে, এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—

‘আমি স্বেচ্ছায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করিয়া সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতেছি। আমি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতেছি এবং মাতৃভুমির স্বাধীনতার জন্য জীবন পণ করিতেছি।

‘আমি সর্বপ্রকারে—এমন কি জীবন পণেও ভারতের সেবা করিব এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিব। নিজেকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থকামনা করিব না। প্রত্যেক ভারতবাসীকে আমার ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া মনে করিব। ধর্ম, ভাষা বা ভৌগোলিক সংস্থানকে আমি কখনো প্রাধান্য দিব না।

১লা ডিসেম্বর ১৯৪৩:

অসামরিক ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ভর্তি করা হইতেছে।

সকাল হইতে লোক আসিতেছে দলে দলে। সকলের মধ্যেই অসীম উৎসাহ! ডাক্তারী পরীক্ষায় যাহারা পাশ হইল না, তাহাদের জন্য সহানুভূতি হইল।

আজিজ্ আসিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিল, কিন্তু সহি করিল না।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘তুমি কি যোগ দিবে না?’

সে বলিল—‘ভাবিতেছি। আপনি তো গোয়ার লোক—পর্ত্তুগীজ গভর্ণমেন্টের প্রজা। তাহারা যুদ্ধের মধ্যে নাই। সুতরাং হার-জিত যাহাই হউক না কেন, আপনাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি বৃটিশ শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করে, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশা হইবে।

আজিজ চলিয়া গেল।

আজ প্রায় ৮ হাজার লোক স্বেচ্ছায় নাম লিখাইয়াছে। নেতাজী সত্যই মানুষকে মাতাইতে পারেন।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৩:

আজ রেডিওতে শুনিলাম, কাল কলিকাতার খিদিরপুর ডকে জাপানীরা বোমা ফেলিয়াছে। উহারা কি নিজেরাই ভারত আক্রমণ করিল?

২০শে ডিসেম্বর ১৯৪৩:

আজাদ হিন্দ্ গেজেটের মাসিক সংখ্যায় একটি ঘোষণা আছে—

‘পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ এক্ষণে আর কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রজা নয়। তাঁহারা আজ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের প্রজা বলিয়া গর্ব অনুভব করিতে পারেন। মালয়ের প্রত্যেক ভারতীয়কে এক কথাটি বুঝাইয়া দিতে হইবে। আমাদের দেশবাসীগণের মধ্যে এই নূতন মর্য্যাদার দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য স্থির করা হইয়াছে যে ইণ্ডিয়ান হণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগের প্রত্যেক সভ্যকে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের নিকট অনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।’

আজ সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে আমাদের নিজস্ব আজাদ হিন্দ্ রেডিওর বেতার বক্তৃতা শুনিলাম।

২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৩:

আজ সন্ধ্যায় কিছু ভালো লাগিতেছে না। পশ্চিমের আকাশে সুর্য্যাস্তের রঙের খেলা চলিয়াছে—তাহারই খানিকটা ঘরের ভিতরে সমস্ত জিনিষের উপর রঙ্ ফলাইয়া দিয়াছিল। এমন সুন্দর সন্ধ্যা—যদি জানকী আসিত।

এমন সময় দরজার পর্দা সরিয়া গিয়া দেখা দিল, দুটি চঞ্চল চোখ। জানকী আসিয়াছে। গতিভঙ্গীমায় উচ্ছ্বলিত লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

‘তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম।’

‘মিথ্যা কথা বলো না—কাহার কথা ভাবিতেছিলে কে জানে?’

তাহার চোখে রহস্যের কুহেলিকা।

‘কি দেখিতেছ?’

‘তোমাকে। আমি ভাবিতেছিলাম—তোমার চোখের চাহনি, তোমার বন্দুকের গুলির অপেক্ষা কম শক্তিশালী কখনই নয়।’

উজ্জ্বল হাসির ধারায় অভিষিক্ত করিয়া সে বিছানার উপর আমার পাশে আসিয়া বসিল।

আমি বলিলাম—‘জানকী, তোমার গান শুনাইবে বলিয়াছিলে। আজ গাহিতে হইবে।’

‘আমি তো গান ভাল জানি না। আমাদের নূতন জাতীয় সঙ্গীত শুনিয়াছ কি?’

‘তাহাই গাও।’

জানকী গাহিল।

হিন্দী কওমি তরানা।

সব সুখ চাঁই কি বরখা বরষে ভারত ভাগ্ হ্যায় জাগা।
পঞ্জাব সিন্দ গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হিমালা নীল যম্‌না গঙ্গা
তেরে নিত্ গুণ গায়ে
তুঝ্‌সে জীবন পায়ে
সব তান পায়ে আশা—
সুরথ্ বন্ কর্ জগ্ পর্ চম্‌কে ভারত নাম্ সুভাগা।
জয়-হো জয়-হো জয়-হো
জয় জয় জয় জয় হো
সব্‌কে দিল মে প্রীত বসে তেরি মিঠি বাণী
হর সুবেকে বহনেওয়ালে, হর্ মজহর কি প্রাণী
সব ভেদ ও ফারাক্ মিটাকে
সব গোদ্‌মে তেরি আকে
গুন্‌ধে প্রেম কি মালা
সুরথ্ বন্ কর্ জগ্ পর্ চম্‌কে ভারত নাম সুভাগা।
জয়-হো জয়-হো জয়-হো
জয় জয় জয় জয় হো
সুবাই সবেরে পঙ্খ পখেরা তেরে হি গুণ গায়েঁ
বাস্ ভারী ভরপুর হাওয়ায়েঁ জীবন মে রাত লায়েঁ
সব্ মিল্ কর্ হিন্দ্ পুকারে
জয় আজাদ হিন্দ কে নারে
পিয়ারা দেশ হামারা
সুরথ্ বন্ কর্ জগ্ পর চম্‌কে ভারত নাম সুভাগা।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৪৩:

আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট নেতাজীর নেতৃত্বে আশাতীতভাবে সংগঠিত হইয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে বালক বৃদ্ধ যুবা—স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মনে এক নূতন উদ্দীপনা—নূতন উৎসাহ জাগিয়াছে। লোকে এখন আর নিজেদের অরক্ষিত মনে করে না। জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে অন্য সকল জাতি অপেক্ষা আমাদের খাতির বেশী। আজ সিঙ্গাপুর ও মালয়ে আমরা বুক ফুলাইয়া চলিতে পারি।

মালয়, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বার্মা প্রভৃতি স্থানে যত ভারতবাসী আছে, সকলেরই সমর্থন ইহা লাভ করিয়াছে—সকলেই উৎসাহের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা হইয়াছে প্রায় সাত লক্ষ। অসংখ্য শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

শাখার সংখ্যা

বার্মায়—১০০

মালয়ে—৭০

শ্যাম—২৪

ইহা ব্যতীত পূর্ব্ব ভারতী দ্বীপপুঞ্জের জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, ইন্দোচীন, চীন, মাঞ্চুকুয়ো প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য শাখা রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—কিন্তু রাষ্ট্র বিদেশীর কবলে। এখানে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে প্রবাসী ভারতবাসীর মনের ভূমিতে; রাষ্ট্র আছে—দেশ নাই।

আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের প্রজা প্রবাসী ভারতবাসী মাত্রেই। আমাদের রাষ্ট্রও গভর্ণমেন্টের যাবতীয় কাজ করিতেছেন। ভারতীয়গণ তাহাদের ট্যাক্স দিতেছেন আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টকে—জাপানীদের নয়!

ইংরেজ যখন জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন দেশের মধ্যে এক ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। লুণ্ঠন, অত্যাচার ও নরহত্যা অবাধে চলিয়াছিল—রক্ষা করিবার কেহ ছিল না। সেই সময় ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ

ভারতবাসীদের রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। তারপর নেতাজী যেদিন আসিলেন, সেদিন হইতে আমাদের মর্য্যাদা স্বাধীন দেশের প্রজার ন্যায়।

যুদ্ধের ফলে অনেক ভারতবাসী শ্রমিকের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। ভারতীয়দের মধ্যে ভিখারীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। ভিক্ষাও মিলিত না—অনেক লোক অনাহারে মারা গিয়াছিল। আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্ট হইতে ইহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। সিঙ্গাপুর ও কুয়ালা-লামপুরে খুব বড় সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

এখানে প্রত্যহ সহস্রাধিক নরনারীকে সাহায্য দেওয়া হয়। খাদ্য ছাড়া প্রয়োজন মত ঔষধ ও পথ্যও দিবার ব্যবস্থা আছে।

বেকার ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতীয়গণ যাহাতে চাষ করিয়া অন্নসংস্থান করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে মালয়ে অনেকটা জায়গা লওয়া হইতেছে।

প্রবাসী ভারতীয়গণের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার যে ব্যবস্থা বৃটিশ আমলে ছিল, তাহা আর নাই। আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্ট স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।

প্রজাদের উন্নতি ও মঙ্গল বিধানই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য; আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্ট সেই কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন।

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৩:

টোকিও মিলিটারী একাডেমিতে শিক্ষার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আজ সংবাদ লইয়া জানিলাম, ৪৫খানি আবেদন আসিয়াছে; ইহাদের মধ্যে মাদ্রাজী ২২ জন, বাঙালী ১১ জন, পাঞ্জাবী ৭ জন, বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী ৪ জন এবং সিংহলী ১ জন। নির্বাচন এখনো হয় নাই। প্রথম দল আগামী বৎসর মার্চ মাসে টোকিও যাইবে। সেখানে জাপানী ভাষায় অধ্যাপনা হইবে। সুতরাং এই ভাষা শিখিতে হইবে। এইজন্য টোকিও গমনের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইল।

২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৪৩:

শীঘ্রই ভারত আক্রমণ আরম্ভ হইবে; তাহার তোড়জোড় চলিতেছে। আমাদের প্রধান অফিস রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হইবে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংগঠিত হইয়াছে। এই সেনাদল প্রধানত ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সব সৈন্য ধরা পড়িয়াছে তাহাদের লইয়া গঠিত। অসামরিক লোকদের লইয়াও একটি বৃগেড তৈয়ারী হইয়াছে। প্রায় ৬০।৭০ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক বেসামরিক অধিবাসী। প্রথমে যখন ফৌজ গঠিত হয় এই কয়টি বিভাগ ছিল।

(১) হিন্দুস্থান ফিল্ড দল:

এই দলে ছিল ১,২ ও ৩ নং পদাতিক বাহিনী, আই-এ-এফ্-সি বাহিনী, ভারী কামান বাহিনী, ১নং ইঞ্জিনিয়ার বাহিনী, ১নং সাঙ্কেতিক সাংবাদিক (সিগ্ন্যালার) দল, ১নং চিকিৎসক বাহিনী এবং ১নং টি-পি-টী বাহিনী।

(২) শার্দুল গেরিলা বাহিনী:

এই বাহিনীতে আছে গান্ধী রেজিমেন্ট, নেহরু রেজিমেন্ট ও আজাদ গেরিলা রেজিমেন্ট।

সম্প্রতি নেতাজীর নামে এক নূতন সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে—বসু বৃগেড্ (১নং রেজিমেন্ট্)।

(৩) বিশেষ সার্ভিস্ দল (স্পেশ্যাল সার্ভিস্ গ্রুপ)

(৪) সংবাদ সংগ্রাহক দল (ইনটেলিজেন্স গ্রুপ্)

(৫) সংরক্ষিত দল (রিজার্ভ)

জাপানীদের সঙ্গে আমাদের সৈন্যদলের কোন সম্পর্ক নাই। বৃটিশেরা আত্মসমর্পণ করিলে যে সকল সাজোয়া গাড়ী, ট্যাঙ্ক, কামান, মেসিনগান, বন্দুক প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল, জাপানীদের সেগুলিতে প্রয়োজন হয় নাই। আমরা সেগুলি পাইয়াছি; শুনিতেছি নেতাজী বিনামূল্যে কোন জিনিষ লইবেন না, পাছে তাহাদের বাধ্যবাধকতায় থাকিতে হয়।

যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য ৯টা মিলিটারি কেন্দ্র আছে। অফিসারদের জন্য যে কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে আছে তাহাতে উপযুক্ত সৈনিকদের আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাদান ও আদেশ হিন্দীভাষায় দেওয়া হইতেছে। কয়েকজনকে উচ্চ সামরিক শিক্ষার জন্য শীঘ্রই জাপানে পাঠানো হইবে।

সৈনিকদের পোষাক অনেকটা ভারতীয় বৃটিশ বাহিনীর অনুরূপ। খাকি পোষাক, মাথায় ক্যাপ; তাহার উপর আই-এন-এ লেখা পিতলের ব্যাজ। প্রত্যেক সৈনিকের বুকের বামদিকে থাকে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত একটী ব্যাজ। এই ব্যাজে ভারতবর্ষের একটা মানচিত্র এবং এই তিনটীশব্দ লেখা আছে—ইত্তিফাক্, ইতমাদ্, কুর্বানি (সহযোগিতা, ন্যায়বিচার ও আত্মোৎসর্গ)।

অফিসারদের বুকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ব্যাজ থাকে। পার্থক্য শুধু কাঁধের পটিতে। আই-এন্-এ ব্যাজের প্রত্যেক দিকে সোনালী তারা ও রেখা দিয়া অফিসারের শ্রেণী নির্দেশ করা হয়:

মেজর—একটি সোনালি রেখা

কাপ্তেন্—তিনটি নীল রেখা

লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট—দুইটি নীল রেখা

সেকেণ্‌ড্ লেফট্‌ন্যান্ট—একটি নীল রেখা

প্রত্যেক রেজিমেন্টের চিহ্ন বিভিন্ন:

গান্ধী রেজিমেন্ট—সবুজ রঙ

নেহরু রেজিমেন্ট—ছাই রঙ

আজাদ রেজিমেন্ট—শাদা রঙ

বসু রেজিমেন্ট—লাল ও সবুজ রঙ

৭ই জানুয়ারি ১৯৪৪: রেঙ্গুন:

আজ কয়েকদিন হইল আবার রেঙ্গুনে আসিয়াছি। আজ আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের অস্থায়ী রাজধানী রেঙ্গুনে স্থাপিত হইল। সিঙ্গাপুর ভারতবর্ষ হইতে অনেক দূর। এবার মনে হইল, দেশের কাছে আসিলাম।

আজ সকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের এক কুচকাওয়াজ হইল। এক দল সৈন্য সমবেত কণ্ঠে হিন্দীতে সমর সঙ্গীত গাহিল। গানের সুরে প্রাণে উন্মাদনা আসে।

‘কদম কদম বাড়ায়ে যা
খুসীকে গীত গায়ে যা
এ জিন্দগী হায় কৌম্ কী
তু কৌম্ পে লুটায়ে যা।

তু শেরে-ই-হিন্দ আগে বাড়
মর্ণেসে ফির ভি তু ন ডর
আস্মান তক উঠাকে শর
জোসে বতন্ বড়ায়ে যা।
তেরী হিম্মত বড়তি রহে
খুদা তেরী শুন্তা রহে
যে সামনে তেরে চড়ে
তু খাকমে মিলায়ে যা।
চলো দিল্লী পুকার কে
কৌমী নিশান সামাল্ কে
লাল কিল্লে পে গাড়কে
লহরায়ে যা লহরায়ে যা।

গানটীর অর্থ—

‘পা ফেলিয়া অগ্রসর হও
আনন্দ গান গাহিয়া যাও।
তোমার জীবন জন্মভূমির

জন্মভূমির জন্য তাহা দান কর।
ভারতের বাঘ! আগে চল;
মরণের ভয় করিও না।
আকাশ তক মাথা উঁচু কর;
জন্মভূমির শক্তি বাড়াও।
তোমার শক্তি বাড়িয়া চলুক;
ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনুন।

তোমার সামনে যে আসিতে সাহস করে
সে যেন মাটীতে মিশাইয়া যায়।
‘দিল্লী চলো’—এই ধ্বনি তুলিয়া
তোমার দেশের নিশান দৃঢ়ভাবে ধরিয়া
লাল কেল্লার উপর তাহা প্রোথিত করিবার জন্য
যুদ্ধে অগ্রসর হও—যুদ্ধে অগ্রসর হও।

কয়েকদিন যাবৎ জাপানী সামরিক কতৃর্ত্পক্ষ ও আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের নায়কদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে অফিসে কাজের ভীড় খুব বেশী। আজ মেজর জেনারেল কাতাকুরার কাছে একটি ফাইল লইয়া গিয়াছিলাম।

২৭শে জানুয়ারি ১৯৪৪:

আজও জাপানী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যুক্ত কমিটির অধিবেশন ছিল। নেতাজী ও জেনারেল কাতাকুরাকে দেখিলাম। শুনিলাম স্থির হইয়াছে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে এবং জাপানীরা তাহাদের সাহায্য করিবে। সেনা বাহিনী ব্রহ্মপুত্রের তীরে পৌঁছাইলে জাপানী সেনাদলও নেতাজীর অধীনে কাজ করিবে উভয় পক্ষের সৈন্য সমাবেশ, সংবাদ আদানপ্রদান এবং সহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। ভারতের মাটিতে পদার্পণের পর নেতাজী সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন; তখন জাপানী সৈন্যবলের সহায়তা প্রয়োজন হইবে কি না এবং কতটা প্রয়োজন তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন নেতাজী। ভারতবর্ষের যখন যে অংশ বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত হইবে, সেই অংশে আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং জাপানীরা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে, সে ভয় নাই।

২৮শে জানুয়ারি ১৯৪৪:

রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ হইয়াছে। প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য নানা দেশ হইতে আসিয়াছে।

সৈনিকদের মধ্যে উৎসাহ দেখিলাম! সে সত্যই স্বপ্নের অতীত। ভারতের সামরিক জাতিগুলি যুদ্ধ করে, কারণ যুদ্ধই তাহাদের পেশা; তাহারা যুদ্ধ করে কোন উচ্চ প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া নয়—নিমকের অর্থাৎ বেতনের জন্য। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বা দেশের প্রতি ভালবাসা কোনদিন ছিল না বলিলেই হয়। ইহারা নিমকের জন্য দেশীয় রাজাদের হইয়া বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে; আবার ইহারাই বিদেশীকে নিজের মাতৃভূমি জয়ে সাহায্য করিয়াছে। এই মোহগ্রস্ত প্রাণগুলির মধ্যে এক নব উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিয়াছেন নেতাজী।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমানে—আবার হিন্দুর মধ্যে জাতিতে জাতিতে বিভেদ রহিয়াছে। কিন্তু যুগে যুগে পুঞ্জীভূত সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত সেই ভেদাভেদ এখানে যেন এক যাদুমন্ত্র বলে অদৃশ্য হইয়াছে। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সৈনিকগণ ভুলিয়া গিয়াছে—তাহারা হিন্দু, মুসলমান, শিখ বা খৃষ্টান—তাহারা এক দেশ-মাতার সন্তান—পরস্পর ভাই-ভাই।

সেনাবাহিনীর মধ্যে ছোট বড় ভেদ নাই। সাধারণ সৈনিক ও অফিসার সকলেই আহার করেন এক জায়গায়। নেতাজীর বেশ সাধারণ সৈনিকের ন্যায়; সকলের সঙ্গে তিনি সমান ভাবে মিশেন।

সৈনিকদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস নেতাজীর নেতৃত্বে তাহারা দেশকে মুক্ত করিতে পারিবে—জয় তাহাদের হইবেই। আমরা পরস্পরকে অতিবাদন করি—নমস্তে বা সেলাম বলিয়া নয়; বলি—‘জয় হিন্দ’— হিন্দুস্থানের জয়। এই শব্দ দুইটির মধ্যে লুকানো আছে পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরের কামনা—সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

আজ পথে দেখা হইল জানকীর সঙ্গে— মিলিটারী বেশে চলিয়াছে একটি যুবক সৈনিকের বাহুপাশে বদ্ধ হইয়া। আমাকে দেখিয়া সে বলিল—‘রেঙ্গুনে আসিয়াই তোমাকে খুঁজিয়াছিলাম। আজ হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। কয়দিন এখানেই আছি—দেখা হইবে। এখন একটু কাজ আছে।’

মুখে জোর করিয়া হাসি ফুটাইয়া তাহাকে বিদায় দিলাম।

জানকী বলিয়াছিল—সে আমায় প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে—চিরদিনই সে আমার থাকিবে। এখনো এক মাস হয় নাই। ভারাক্রান্ত দুঃস্বপ্নের মতো তাহার স্মৃতি মনের মধ্যে নাড়া দিয়া উঠিল। ব্যথাভারানত একটি দীর্ঘশ্বাস কখন অজ্ঞাতে বাহির হইয়া গেল।

২৯শে জানুয়ারী ১৯৪৪:

আজ পর্য্যন্ত অনেকগুলি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তাহার মধ্যে আছে জার্মানী, ইটালী, ক্রোশিয়া, জাপান, মাঞ্চুকুয়ো, ন্যাংকিং (চীন), ফিলিপাইন, শ্যাম ও ব্রহ্ম গভর্ণমেন্ট। আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে আজ প্রথম ভারত তাহার স্থান লাভ করিল। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বা ম আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা

করিতেছেন। আয়ার ও স্পেনও আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টকে মানিয়া লইবেন বলিয়া শুনিলাম।

আজ একজন বার্মীজ ব্যবসায়ীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে—ফ্রন্টে যাত্রার পূর্বে তিনি আমাদের ছয়জন সঙ্গীকে একটি ছোট পার্টি দিবেন। খাবার শুনিলাম বর্মী রীতিতে তৈয়ারী হইবে।

ভাত, ডাল ও তরকারী। তরকারিগুলির মধ্যে নাপ্পি ব্যবহৃত হওয়ায় আমার সাথীরা খাইতে পারিলেন না। আমার অভ্যাস থাকায় অসুবিধা হইল না। নাপ্পি পচা মাছে তৈয়ারী হয়। একটা হাঁড়ির মধ্যে অনেক দিন রাখিয়া দিলে যখন পচিয়া গলিয়া যায়, তখন মাছের কাঁটাগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তখন উহা দেখিতে হয় অনেকটা ঘি-এর মত তরল। রান্নার সময় সকল ব্যঞ্জনেই নাপ্পি ব্যবহার করা হয়। যখন রান্না হয় তখন বিদেশীরা উহার দুর্গন্ধে পলায়ন করে। রান্নার পর কিন্তু গন্ধ খুব কমই থাকে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪:

এইবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আজ নেতাজী সেনাবাহিনীর উদ্দেশে যে বাণী দিয়াছেন তাহা মর্ম্মস্পর্শী। নেতাজীর বাণী পাঠ করিয়া শুনানো হইল।

‘দূরে, বহুদূরে— নদ নদী ছাড়াইয়া, অরণ্য পর্বত ছাড়াইয়া— ঐ আমাদের মাতৃভূমি! ঐ দেশে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। ঐ শোন! ভারত আমাদের ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকিতেছে। আটত্রিশ কোটি দেশবাসী আমাদের আহ্বান করিতেছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাকিতেছে।

‘উঠ। নষ্ট করিবার মত সময় নাই। অস্ত্র হাতে নাও। দেখ, তোমার সম্মুখে স্বাধীনতার পথ রহিয়াছে। যে পথ আমাদের পূর্বগামীরা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রুসেনার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইব। ভগবান যদি চাহেন, আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌছিবেন, শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব।’

‘দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!’

চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, আমাদের মহীয়সী মাতৃভূমি—আরাকান্ য়োমা পর্বতশ্রেণী—চিন্দুইন নদী ছাড়াইয়া—নিবিড় অরণ্যের পরপারে। মনে হইল—এবার এই নির্ব্বাসিত জীবন শেষ হইবে— দেশে ফিরিব। বাড়ীর প্রতি একমাত্র আকর্ষণ—বৃদ্ধা মা। তিনি কি বাঁচিয়া আছেন?—নাই, একথা মন বলিতে চাহে না। দেশের জন্য আকুল আগ্রহ মনে জাগিয়াছে।

১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪: মেইমিয়ো:

আজ মেইমিয়োতে জরুরি কাগজপত্র লইয়া আসিয়াছি। মেইমিয়ো জাপানী বাহনীর একটি প্রধান ঘাঁটি। বার্মায় দুটি বড় ঘাঁটি—একটি রেঙ্গুনে, আর একটি মেইমিয়োতে।

মেইমিও মান্দালয় লাসিও রেলওয়ে লাইনে একটি ষ্টেশন—রেঙ্গুন হইতে ৪২২ মাইল দূরে। শহরটি পাহাড়ের উপর—প্রায় ৩৫০০ ফিট উচ্চে। এককালে এখানে বার্মার লাট সাহেবের গ্রীষ্মাবাস ছিল। পুরাতন গভর্ণমেন্টের

বাড়ীগুলি এখন জাপানী সেনাবিভাগের ব্যবহারে আসিয়াছে। বৃটিশ আমলেও এখানে মিলিটারির বড় আস্তানা ছিল।

সেন্‌ট্‌ জোসেফ স্কুলের বাড়ীতে আমার থাকিবার স্থান হইয়াছিল।

এখানে কর্ম ব্যস্ততার চিহ্ন খুব বেশী দেখা গেল। সম্ভবত ভারত আক্রমণের আয়োজন চলিতেছে।

আমাদের উপর নির্দেশ ছিল উত্তর বার্মার জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং মোতাগুচির হাতে কাগজগুলি দিবার জন্য; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহার সহকারী কাগজগুলি গ্রহণ করিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪: রেঙ্গুন:

রেঙ্গুনে ফিরিয়াছি।

টোকিওতে ফার ইষ্টার্ন্ এশিয়াটিক কন্‌ফারেন্সে জেনারেল তোজোর ঘোষণা অনুসারে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেন্টের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য জাপানীদের বঙ্গোপসাগরে এই দ্বীপগুলি একটি প্রধান ঘাঁটি; এজন্য ঠিক হইয়াছে যে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই দ্বীপগুলির অসামরিক কর্তৃত্ব শুধু আমাদের হাতে দেওয়া হইবে—যুদ্ধের পর জাপানীরা তাহাদের সকল সৈন্য সরাইয়া লইয়া যাইবে।

কর্ণেল লোকনাথন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। পোর্ট ব্লেয়রে অজাদ হিন্দ্ সঙেঘর শাখা আছে।

আন্দামান দ্বীপের নাম শহীদ দ্বীপ রাখা হইবে, কারণ ভারতের স্বাধীনতার জন্য অনেকে ঐ দ্বীপে নির্বাসন ভোগ করিয়াছেন। নিকোবর দ্বীপেরও নাম পরিবর্তিত করিয়া রাখা হইবে স্বরাজ দ্বীপ।

শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপে স্বাধীন ভারতের পতাকা প্রথম উড্ডীন হইবে!

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯২৮:

আজ লেফ্‌টন্যান্ট্ বিশ্বম্ভরদাসের নিকট শুনিলাম নেতাজীর প্রাণ নাশের চেষ্টার কাহিনী। বিশ্বম্ভর দাস বাহাদুর দলের নায়ক এবং নেতাজীর বাসভবনের রক্ষীদলের ভার তাঁহার উপর। নেতাজীর বাসভবনে দিনরাত্রি পাহারার ব্যবস্থা আছে। এই রক্ষীদল দুইভাগে বিভক্ত—একদল ইউনিফর্ম্ পরিয়া পাহারা দেয়, আর একদল সাধারণ অসামরিক পোষাকে থাকে। উভয়েরই নিকট রিভলভার প্রভৃতি থাকে। বাড়ীর বাহিরে পাঁচজন সৈনিক সাধারণ পোষাকে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। বাড়ীর প্রাঙ্গনের ভিতরে থাকে আটজন ইউনিফর্ম্ পরিহিত রক্ষী।

সেদিন অন্ধকার রাত্রি। তখন ১১টা। রক্ষী বদল যথারীতি হইল। একদল রক্ষী ব্যারাকে চলিয়া গেল, তাহাদের স্থান গ্রহণ করিল আর এক দল। বাড়ীর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই সেনানিবাস। পাহারা শেষ হইলে এই রক্ষীরা যখন ফিরিয়া আসে, সেই সময়ে সেনানিবাসে ৫০।৬০ জন মাত্র সৈনিক ছিল।

বিশ্বম্ভর দাসের মনে হইল—কোন বাহিরের লোক সেনা নিবাসে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তখনি সকলকে লাইনে দাঁড়াইতে আদেশ দিলেন। প্রত্যেকে নিজের নাম ও সংখ্যা বলিল। দুইজন লোক একই নাম ও সংখ্যা বলিল! তিনি এই দুইজনকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দিলেন। উহাদের মধ্যে একজন একটি রিভলভার বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিল এবং পলায়নের চেষ্টা করিল। তখনি সকলে তাহার হাত হইতে রিভলভার কাড়িয়া লইল। দুইজনেই বন্দী হইল।

এই সময় নীচে গোলযোগ হওয়ায় নেতাজী বাড়ীর দ্বিতল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হইয়াছে। লোক দুইটি স্বীকার করিল, তাহারা নেতাজীকে হত্যা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর হইতে রক্ষীনিবাসের উপর কড়া নজর রাখা হইল।

এই মাসেই আর একবার নেতাজীর প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। সেদিনও রাত্রিকাল—নিবিড় অন্ধকার। বিশ্বম্ভর নাথ বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন। এই সময় একটি মোটার আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মধ্য হইতে একজন লোক নামিয়া আসিল। তাহাকে দেখিতে রাসবিহারী বসুর ন্যায়। সে গাড়ী হইতে নামিয়া নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিল। বিশ্বম্ভর নাথ তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল—‘রাসবিহারী

বসু'। আরও বলিল—'আমি টোকিও হইতে আসিতেছি—খুব জরুরি দরকার। নির্জনে দেখা করিতে চাই।'

বিশ্বম্ভরনাথ রাসবিহারী বসুকে কখনো দেখেন নাই, তবে তাহার ছবি দেখিয়াছেন এবং সেই ছবির সহিত এই লোকটির সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হইল। তিনি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নেতাজীকে তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে গেলেন।

রক্ষীদের মধ্যে একজন রাসবিহারী বসু যখন সিঙ্গাপুরে আসিয়াছিলেন, সেই সময় প্রায় এক সপ্তাহ কাল তাঁহার বাসায় পাহারা দিয়াছিল। রাসবিহারী বসু আসিয়াছেন শুনিয়া সে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র বৃদ্ধ মোটারের মধ্যে উঠিয়া বসিল এবং গাড়ী চলিয়া গেল। রক্ষী বলিয়া উঠিল—'এতো রাসবিহারী বসু নয়।'

এদিকে বিশ্বম্ভরনাথের কাছে রাসবিহারী বসু আসিয়াছেন শুনিয়া নেতাজী স্বভাবতই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন।

'রাসবিহারী বসুতো টোকিওতে আছেন। আজ সন্ধ্যায় রেডিওতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি; ইহার মধ্যে তিনি কি করিয়া আসিবেন। যাহা হউক লোকটিকে আমি দেখিতে চাই।'

বিশ্বম্ভরনাথ নীচে আসিয়া দেখিলেন—লোকটি পলায়ন করিয়াছে।

১লা মার্চ্ ১৯৪৪:

অজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকদল ইতিমধ্যেই আরাকান্ ও চিন্ হিলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। চিন্ পর্ব্বতমালা বামার উত্তর-পশ্চিমে ভারত সীমান্তে অবস্থিত।

আজ আমি লেফট্ন্যান্ট পদে উন্নীত হইয়াছি। নেতাজী আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সিঙ্গাপুরে মিলিটারি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম। অফিসের কাজ ভাল লাগে না; যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার জন্য আবেদন করিয়াছি।

২রা মার্চ ১৯৪৪: কালেওয়া:

আমাদের ছোট একটি দল কালেওয়া আসিয়াছে। পাহাড়ের উপর একটি ছোট শহর—উত্তর বর্মার চিন্দুইন্ জেলায়। মণিপুর নদীর কাছেই তাঁবুতে আছি। মণিপুর নদী এইখানে চিন্দুইন্ নদীর সঙ্গে মিলিয়াছে। শীত খুব—কম্বলে ভাঙ্গে না। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী— শীতে অভ্যস্ত নই; সুতরাং কষ্ট হইতেছে।

ফালাম হইতে হবিব আসিয়াছে। সেখানে শাত আরও বেশী। ফালাম্ ৫৩০০ ফিট্।

আরাকান ও মণিপুর রাজ্যের সীমান্তে—কালে, কালেওয়া, কিনাত, টিডডিম্ প্রভৃতি স্থানে চিন্দুইন্ ও মণিপুর নদী ধরিয়া আমাদের সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। তিন ডিভিসন সৈন্য এই আক্রমণে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক ডিভিসনে আছে প্রায় ৭।৮ হাজার সৈনিক।

১নং ডিভিসন্—সুভাষ বসু বাহিনী

২নং ডিভিসন্—গান্ধী বাহিনী

৩নং ডিভিসন্—আজাদ বাহিনী।

একটি রিজার্ভ সৈন্যদল আছে মান্দালয়ে।

৩রা মার্চ ১৯৪৪:

আজ নেতাজীর বাণী প্যারেডের সময় পড়িয়া শুনানো হইল। রণাঙ্গনে অবস্থিত সেনাবাহিনীর উদ্দেশে এই বাণী তিনি দিয়াছেন:—

৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪:

সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আরাকান রণাঙ্গনের উপর নিবদ্ধ হইয়াছে—যেখানে আজ দূর প্রসারী ফলপ্রসূ ঘটনাসমূহ ঘটিতেছে। জাপানী বাহিনীর সহিত সহযোগে আজাদ হিন্দ ফৌজের গৌরববাজ্জ্বল বীরত্ব এই অংশে ইংরেজ ও আমেরিকার পাল্‌টা আক্রমণের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আরাকান রণাঙ্গনে আমাদের সহকর্মীগণের আদর্শ আজাদ হিন্দ ফৌজের সকল অফিসার ও সৈনিককে অনুপ্রাণিত করিবে।

আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত দিল্লী অভিমুখে যাত্রা আজ আরম্ভ হইয়াছে। আরাকান পর্বতমালার উপর যে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা প্রোথিত হইয়াছে, যতদিন না তাহা বড়লাটের প্রাসাদে উড়ে ততদিন আমাদের এই যাত্রা চলিবে।

বন্ধুগণ, ভারতের মুক্তি বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকগণ! তোমাদের মনে যেন একটি দৃঢ় সঙ্কল্প থাকে—‘হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু’। আমাদের মুখে শুধু একটি বুলি থাকিবে—‘দিল্লী চলো।’ দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। ঐ পথেই আমাদের মার্চ্ করিতে হইবে। জয় আমাদের নিশ্চয়ই হইবে।

সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক

১২ই মার্চ্ ১৯৪৪: কিনাত:

আমাদের প্যালেল্-টামু অঞ্চলে অগ্রসর হইতে হইবে—লক্ষ্য মণিপুর। টামু মণিপুর রাজ্যে—বার্মার সীমান্তে।

কাল কিনাত পৌঁছিয়াছি। এই ক্ষুদ্র শহরটি চিন্দুইন্ নদীর বাম তীরে।

আজ বসু ব্রিগেডের সেকেণ্ড লেফট্‌ন্যান্ট সত্য মুখার্জি আমাদের ব্রিগেডে বদলি হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট কালাদানের যুদ্ধের গল্প শুনিলাম। কালাদান আরাকানে—চট্টগ্রামের দক্ষিণে। এখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদলের সহিত আমেরিকান নিগ্রোদের এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে অনেক নিগ্রো সৈনিক নিহত হয়।

১৮ই মার্চ ১৯৪৪: মণিপুর:

আজ আমরা বার্মা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পন করিয়াছি। কোন বাধা পাই নাই।

২০শে মার্চ ১৯৪৪: টামুর অভিমুখে:

মাথার উপরে এরোপ্লেনের শব্দ—কয়েকটি বৃটিশ এরোপ্লেন্ আসিতেছে। আমরা পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছি। এখানে থাকা নিরাপদ নয়; দেখিতে পাইলে উপর হইতে মেসিন্ গান্ চালাইবে। আমরা তাড়াতাড়ি নামিয়া পাহাড়টীর সানুদেশে জঙ্গলের মধ্যে গাছের নীচে লুকাইলাম।

ফট্-ফট্-ফট্-ফট্—এরোপ্লেন্ হইতে গুলি বর্ষণ হইতেছে। আমাদের দেখিতে পাইয়াছে। ফট্-ফট্-ফট্-ফট্—ফট্-ফট্-ফট্-ফট্—শব্দের যেন বিরাম নাই; মধ্যে মধ্যে আলোক জ্বলিয়া উঠিতেছে। মাথার উপর এবোপ্লেন্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে। এমন সময় একটা ভীষণ শব্দ হইল। মনে হইল, সমস্ত পৃথিবী যেন উল্‌টাইয়া যাইতেছে—চোখের সামনে রাশি রাশি আলো—

তারপর কি হইল জানি না। যখন চোখ চাহিলাম—আমার পাশে বসিয়া আছে লালতুই। বড় জলতৃষ্ণা; ফ্লাস্ক হইতে জল আমার মুখে ঢালিয়া দিল। এবোপ্লেনের শব্দ আর নাই—শত্রু চলিয়া গিয়াছে। বোমা পড়িয়াছিল কাছেই। আমার পাশে ছিল মহান্তি—বোমার স্প্লিন্‌টার্ লাগিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি আশ্চর্য্যরকম বঁচিয়া গিয়াছি। আমাদের আরও দুইজন সঙ্গীর মৃত্যু

হইয়াছে। তাহারা যেখানে শেলটার্ লইয়াছিল, ঠিক সেই জায়গায়ই বোমা পড়ে। তাহাদের দেহের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।

মহান্তীর বাড়ী কটকের কাছে কি একটা গ্রামে। তাহার স্বদেশের দ্বার প্রান্তে আসিয়া সে শেষ শয্যা গ্রহণ করিল। কয়দিন এক সঙ্গে দিনরাত্রি কাটাইয়াছি; আজ তাহার মৃত্যুতে মন ভারাক্রান্ত হইল। তবু মনে হইল— মহান্তী বীরের মৃত্যু বরণ করিয়াছে। সজল নয়নে নীরবে তাহাকে সমাহিত করিলাম। দাহ করিলে সেই আগুন শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাই ইচ্ছা সত্বেও তাহা করা গেল না।

৩১শে মার্চ ১৯৪৪: মণিপুর উপত্যকা:

আজ আমরা মণিপুরের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছি। আমাদের সম্মুখে মণিপুরের রজধানী ইস্ফল।

আজ মণিপুরের দক্ষিণ অংশ স্বাধীন। নেতাজী ও জাপ সেনানায়ক জেনারেল্ কাওয়াবে এই দুইজনের সম্মিলিত ঘোষণা প্রচারিত হইল। ভারতের এই মুক্ত অঞ্চল আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের শাসনাধীন হইল। কর্ণেল্ এ. সি. চ্যাটার্জি মুক্ত ভারতের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। মেজর কিয়ানি তাঁহার অধীনে দেশ শাসন করিবেন। বৃটিশের কবল হইতে মুক্ত অংশে যে সকল সম্পত্তি বা সমর সম্ভার পাওয়া যাইবে তাহা আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট পাইবেন।

সকলের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। আমরা সত্যই নিজেদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছি—জাপানীদের ক্রীড়নক নই।

আমার উপর আদেশ হইয়াছে বিষ্ণুপুরে যাইবার জন্য।

১লা এপ্রিল ১৯৪৪: বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর মণিপুর উপত্যকায় প্রায় মাঝামাঝি; ইহার প্রায় মাইল খানেক উত্তরে লোগতাক্ হ্রদ।

বিষ্ণুপুরে দেখিবার জিনিষ—নিত্যানন্দজীর মন্দির। মন্দিরটীর ছাউনি করগেট্ টীনের। সামনে একটী নাট মন্দির—সেটীরও খড়ের ছাউনি। এই মন্দির মণিপুর রাজ্যের দান হইতে চলে। মণিপুরের রাজারা বৈষ্ণব—বাঙলার বৈষ্ণব মতের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত। ইহাদের তীর্থস্থান বাঙলা দেশের নবদ্বীপ। নবদ্বীপ হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটী শহর। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের বাজারের কাছেই একটী টীলা রহিয়াছে। এই টীলার উপরে একটী প্রাচীন কেল্লার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটী ইঁটের মন্দির আছে। এই জায়গাটার নাম শান্তিপুর।

লালতুই জাতিতে কুকী। সে নাগা ও মণিপুরী ভাষা জানে বলিয়া আমার খুব সুবিধা হইয়াছে। লালতুই-এর সাহায্যে এক মণিপুরীর সঙ্গে পরিচয়

হইল। ভদ্রলোকের নামটা মনে নাই—কি যেন সিং।

খর্বাকার দেহ, নাক খেঁদা, চোখ দুটী ছোট, মুখে গোঁফের অল্প রেখা, রঙ বেশ ফর্সা; বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে। চেহারা মঙ্গোলীয় ধরণের। পরিধানে ধুতি ঠিক বাঙালীদের মতন; গায়ে শাদা চাদর, মাথায় পাগড়ী, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক।

সিং-এর কুটীর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঁশের বেড়া, খড়ের ছাউনি। কুটীরের সামনে বারান্দা। উঠানে তুলসী মঞ্চ। বারান্দায় একটী তাঁত রহিয়াছে। একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়সের মেয়ে তাঁতে ‘ফনেক্’ শাড়ী বুনিতেছিল। এই সাড়ী তিন হাত চওড়া, পাঁচ হাত লম্বা। দেড় হাত করিয়া কাপড় বুনিয়া পরে দুইটী অংশ সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেয়। তাঁতটী নূতন ধরণের— কোমরে বাঁধিয়া হাতে চালাইতে হয়।

আমি বলিলাম—‘বেশ সুন্দর বোনা হইতেছেতো! চমৎকার পাড়।’

সিং বলিলেন—‘যুদ্ধের জন্য আমাদের কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই কাপড়টী বোনা প্রায় শেষ হইয়া পড়িয়া ছিল। কাপড় নাই। তাই আজ আমার মেয়ে কাপড়টী শেষ করিতেছে!

মেয়েটাকে দেখিতে বেশ। ইহার পোষাকের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। পরিধানে ফনেক্ শাড়ী—বক্ষ হইতে পা পর্য্যন্ত অঙ্গ ঢাকিয়াছে। একখানি ওড়নায় মাথা ও দেহের উর্দ্ধাংশ আবৃত। মাথায় এলো খোঁপা, নাকে ও কপালে তিলক। আমার অনুরোধে মেয়েটী কাপড় বোনা দেখাইল।

আজ সন্ধ্যায় নিত্যানন্দজীর নাটমন্দিরে স্থানীয় লোকদের এক সভা ছিল। নেতাজীর ঘোষণা সিং মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন। কাপ্তেন এম্, এ, মালিক বিষ্ণুপুরের শাসনকর্ত্তা; তিনি নিজে আসিলে ভালো হইত।

স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা প্রথম মণিপুর ও নাগা পাহাড়ের ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছে। আমরা স্বাধীন—স্বাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়াইয়া আছি। কয়েকটি মণিপুরী যুবক আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। কিন্তু সাধারণ লোকের মনে কোনরূপ রাজনৈতিক চেতনা নাই। স্বাধীনতা ও অধীনতার মধ্যে পার্থক্য তাহারা বুঝে না।

সন্ধ্যা হইতে ভীষণ মশার আক্রমণ হইল। লাল্‌তুই বলিল—সেই ভদ্রলোক রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আজ শরীরটা ভালো মনে হইতেছে না—নিমন্ত্রণ বাদ দেওয়াই ঠিক হইল।

লাল্‌তুই-এর নিকট মণিপুরের কাহিনী শুনিলাম। প্রায় ৫৩ বৎসর পূর্বে (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) মণিপুরের রাজা কুলচন্দ্র ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার সেনাপতি টিকেন্দ্রজিত সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। এই বিদ্রোহ সফল হয় নাই।

২রা এপ্রিল ১৯৪৪:

আজ পর্য্যবেক্ষণের জন্য এরোপ্লেন যাইতেছে। আমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে। আমাকে কোহিমা রণাঙ্গনে রিপোর্ট করিতে হইবে।

আকাশের বুক চিরিয়া এরোপ্লেন্ চলিতেছে। অনেক নীচে লোগতাক্ হ্রদ-রৌদ্রের আলোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। চারিদিকে নীল পাহাড়ের মধ্যে রূপালি হ্রদের জলরাশি ছবির মত দেখাইতেছে। হ্রদের জলের মধ্যেও কয়েকটী পাহাড় মাথা তুলিয়াছে।

পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী—ঘন সবুজ ও ঘন নীল হইতে ক্রমে ক্রমে ফিকা নীলে পরিণত হইয়াছে। পাহাড়ের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রূপালী চাদরের মত মণিপুর নদী বহিয়া গিয়াছে।

অদূরে ইম্ফল্ শহর দেখা গেল। এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট্ গানের লক্ষ্য হইতে দূরে থাকিয়া পাইলট এরোপ্লেন্ লইয়া চলিল। শত্রুসেনার অবস্থান যতদূর সম্ভব পর্য্যবেক্ষণ করা হইল।

মণিপুর নদীর ধারে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের ধ্বংশাবশেষ দেখা গেল। নদী এখানে আঁকিয়া বাঁকিয়া দক্ষিণ দিকে বহিয়া গিয়াছে। গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়াগুলি নীল আকাশের গায়ে সুন্দর দেখাইতেছিল।

আমরা যখন কোহিমা ফ্রন্টের ছাউনির নিকট পৌছিলাম, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে।

কোহিমার পথে ভারত আক্রমণের দিকেই বেশী জোর দেওয়া হইবে। কোহিমার উত্তর দিকে পাহাড় এবং নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়া এই পথ আসামে গিয়াছে। এই দুর্গম পথে সৈন্য চালনা কঠিন। কিন্তু জাপানীদের নিকট পাহাড় ও জঙ্গল-যুদ্ধ আমরা শিখিয়াছি। এবিষয়ে তাহারা ওস্তাদ।

কোহিমা ফ্রন্টে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটী রেজিমেন্ট্ লড়াই করিতেছে। সেনানায়কের নামের আদ্যক্ষরে প্রত্যেক দলের নামকরণ হইয়াছে।

‘এ’ পার্টি—কাপ্তেন্ আজমীর সিং-এর নাম অনুসারে

'এম্' পার্টি—লেফ্‌ট্‌ন্যান্‌ট্‌, মুহম্মদ হুসেনের নাম অনুসারে

'জি' পার্টি—লেফ্‌ট্‌ন্যান্‌ট্‌ গুরুচরণ সিং-এর নাম অনুসারে ইহা ছাড়া একটা বাড়্‌তি রেইন্‌ফোর্সমেন্ট (Reinforcement) দল আছে; তাহার নায়ক লেফ্‌ট্‌ন্যান্‌ট্‌ দল বাহাদুর।

আমরা কোহিমার পথ চিনি না। জাপানীরা এই পথের সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছে এবং এরোপ্লেন্ হইতে সার্ভে করিয়াছে। কিকারি দলে গুপ্তচরদের মধ্যে বাঙালী, মণিপুরী, অহমিয়া, নাগা ও বর্মীজ্‌ আছে। ইহারা নানা ছলে ইংরেজদের ঘাঁটীগুলিতে গিয়া সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনে। জাপানী সেনাপতি কর্ণেল্‌ য়ামামোতা ও জেনারেল্‌ ইসোভা আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন।

আমরা খুব ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছি। পাহাড় ও জঙ্গল—জঙ্গল ও পাহাড়; চড়াই ও উতরাৎ—উতরাই ও চড়াই। পথের যেন শেষ নাই। যতদূর দেখা যায়, ততদূরই কালো পাহাড়ের 'সারি' মেঘের ঢেউ-এর মত সাজানো রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে উঠিবার সময় কাঁটাগাছে লাগিয়া দুটী হাত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

আমাদের সঙ্গে ভারী মোট বিশেষ কিছু নাই; তাই সুবিধা। অমদের সঙ্গে রাইফেল্‌ ও পিস্তল আছে। তাহা ছাড়া আমাদের দলে মেসিন গান ও ব্রেন্‌ গান্‌ পাইয়াছি। এইগুলি ভারী নয়—বেশ হাল্কা—নাড়াচাড়া করা ও চালানোও সোজা। একজন মাত্র লোক ব্রেন্‌ গান্‌ চালাইতে পারে। মিনিটে প্রায় দেড়শত গুলি ছোঁড়া যায় এবং ছয় শত গজের মধ্যে শত্রু থাকিলে ইহা দ্বারা শত্রুনাশ করা চলে।

আজ একজন চর কোহিমার সংবাদ আনিল—কোহিমার পথে ফেক্‌ ও খারাসন্‌ গ্রামে ইংরেজদের ঘাঁটী আছে; সেখানে বার্মা ও আসাম রেজিমেন্টের সৈন্য রহিয়াছে। কোহিমা শহর ইংরেজদের একটি বড় ঘাঁটী। এখানে ৪।৫ হাজার সৈন্য আছে—তাহার মধ্যে বৃটিশ ও ভারতীয় উভয় সৈন্যই আছে। ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে দ্বিতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও তৃতীয় আসাম রাইফেল বাহিনী প্রধান।

কোহিমা আসামের নাগা পাহাড় জেলার প্রধান শহর। বেঙ্গল-আসাম রেলপথের ডিমাপুর ষ্টেশন হইতে ৪৬ মাইল দূরে। নাগা পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার এইখানে থাকেন। জি, টি, পাহাড় হইতে কোহিমা শহরে জল সরবরাহ হয়।

মণিপুর রোড হইতে গৌহাটী মাত্র ১৫০ মাইল। বেঙ্গল ও আসাম রেলপথ ডিমাপুর হইতে লাম্‌ডিং দিয়া গৌহাটী গিয়াছে। ডিমাপুর হইতে সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকাও বেশীদূর নয়। পার্বত্য অঞ্চলের যুদ্ধে জয়লাভ হইলে বাঙ্‌লা দেশে আমাদের অগ্রগতি সহজ হইবে। তাই কোহিমা আমাদের চাই।

৩রা এপ্রিল ১৯৪৪: নাগা পাহাড়:

নাগা পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মাঝে মাঝে দেখিলাম এক নূতন ধরণের চাষ। পাহাড়ের গায়ের উপর সাজানো ডালা-কাটা ক্ষেত। পার্বত্য নদীর জল ক্ষেতের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; একটি ডালা কাটা ক্ষেতের জল উপ্‌ছাইয়া অন্য ক্ষেতে পড়িতেছে। পাহাড়ের গায়ে ধানের এরকম ক্ষেত আমি পূর্বে কখনো দেখি নাই। নাগাদের জুম ক্ষেত দেখিবার জিনিষ।

পাহাড়ের উপর নাগাদের বস্তি। নাগা সর্দার আসিয়াছে আমাদের লইয়া যাইতে। এই বস্তি পূর্বেই অধিকৃত হইয়াছে। দূর হইতে ঐ বস্তি দেখা যায় না—চারিদিকে শাল বন।

কাছে আসিয়া দেখিলাম—চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। পাহাড়ের উপর এই পল্লীটি যেন একটী কেল্লা। ভিতরে খড়ের ছাওয়া অনেকগুলি কুটীর। একটা কুটীরের দরজার উপর বাইসনের শিং সাজানো রহিয়াছে; দেয়ালের গায়ে ঢাল, কাটারি ও বল্লম টাঙ্গানো।

নাগা বস্তির বাহিরে আমরা তাঁবু খাটাইলাম। সর্দার ও তাহার সঙ্গীদের সরল ব্যবহার খুব ভালো লাগিল। এরা সাহসে দুর্জয়— হিংস্র পশুর মত, অথচ কত সরল, ঠিক শিশুর মত।

আজ সন্ধ্যায় একটা নূতন জিনিষ দেখিলাম নাগাদের নাচ। গ্রামের মধ্যে একটু সমতল জায়গা; সেইখানে নাচের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ—বালক বালিকা—যুবক যুবতী সমবেত হইয়াছে।

নাগাদের পেশীবহুল দেহ ও বিচিত্র সমরসজ্জা চোখের সম্মুখে এক স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিল। পুরুষদের ডান হাতে বল্লম, বাম হাতে ঢাল। বল্লম লোহার তৈয়ারী—ধরিবার অংশটী ছাগলের লোম দিয়া বাঁধা। সাজ অদ্‌ভুত—পরিধানে গাছের ছাল, গলায় কড়ি ও শাঁকের মালা, মাথায় মুকুট। কয়েক জনের মুকুটের সঙ্গে দুটী শিং বাঁধা।

নাগা মেয়েদের সাজও বিচিত্র। গলায় নানা রঙের পুঁথির মালা, কাণে কাণবালা, হাতে চুড়ি, মাথার খোঁপায় বন্য ফুল।

কয়েকটী বড় বড় ঢোল বাজিয়া উঠিল। স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলিয়া একত্রে তালে তালে নাচিতে লাগিল। তারপর পুরুষেরা একদিকে দল বাঁধিয়া দাড়াইল—অন্য দিকে দাঁড়াইল মেয়েরা। মেয়েরা গান গাহিতে লাগিল।

এবার পুরুষের একা নাচিতে লাগিল—শিকারীর নাচ। বল্লম উচ্চে তুলিয়া বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচ চলিল। মাঝে মাঝে উচ্চে লাফ দিতেছিল। যেন বন্য পশুর সহিত যুদ্ধের অভিনয়।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৪: কোহিমার পথে:

পার্বত্য পথে চলিয়াছি। পথ প্রদর্শক লালতুই। চারিদিক নিস্তব্ধ। উচ্চ নীচ টিলা, উপত্যকা, বনরাজি, পার্বত্য তটিনী পার হইয়া চলিয়াছি। পথে একটি ছোট ঝরণা পড়িল—ঝির্ ঝির্ করিয়া স্বচ্ছ জল ধারা পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে। পথ ক্রমে দুর্গম হইয়া আসিয়াছে। সঙ্কীর্ণ পথ—একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্য দিকে গভীর খাদ; পদস্খলন হইলে নীচে যে কোথায় গিয়া পড়িব তাহার ঠিক নাই। রানার সংবাদ দিয়াছে—শত্রু নিকটেই আছে, সুতরাং আমরা খুব সাবধানে চলিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার তাহার কালো চাদর খানি দিয়া গাছপালা পাহাড় পর্বত সব ঢাকিয়া ফেলিতেছে। লালতুই বলিল—কাছেই একটি গ্রাম আছে, পথের দুর্গম অংশ শেষ হইয়াছে। অন্ধকারে এরকম পথে চলা কঠিন; আজ রাত্রির মতন এক জায়গায় থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের কাছে আসিয়াছি—কুটীরগুলি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অর্দ্ধেক রাত্রে কামানের শব্দে জাগিয়া উঠিলাম—গুম্-গুম্। লালতুই বলিল—বোধ হয় কোন গ্রামের লোক আমাদের অবস্থানের সংবাদ দিয়াছে। একটী কুটির জ্বলিতেছে; তাহার আলোকে অনেকটা স্থান আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকে দেখা গেল শত্রুর সংখ্যা বেশী নয়।

আমরা গ্রামের শেষপ্রান্তে পাহাড়ের ধারে ছিলাম। শত্রু যেখানে আছে সেই স্থান আমাদের অনেক নীচে। সুবিধা আমাদের দিকে। শত্রু আমাদের ব্রেন্ গানের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের কামানগুলি এক সঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল। গুম্-গুম্, পট্-পট্-পট্-পট্—মরণের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। গ্রামের মধ্য হইতে কান্নার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। শত্রুর লক্ষ্য গ্রাম—আমাদের অবস্থান বুঝিতে পারে নাই।

আগুনের আলোকে দেখিলাম—শত্রু গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের মেসিন গান্ তাহাদের উত্তপ্ত আমন্ত্রণ জানাইল।

শত্রুর অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। তাহাদের দিক হইতে কামানের—শব্দ নীরব হইয়া গেল। থাপা বলিল উহার পলায়ন করিল। উভয়পক্ষেই হতাহত হয় নাই।

৫ই এপ্রিল ১৯৪৪:

আমাদের অগ্রগামী দল কোহিমার কাছে পৌঁছিয়াছে। কোহিমার কাছে যুদ্ধ চলিতেছে।

আমি ও লালতুই কোহিমার দিকে চলিয়াছি অগ্রগামী সেনাদলের সহিত যোগদানের জন্য।

বরাক নদী পার হইলাম। বরাকের আর এক নাম—সুরমা। লালতুই বলিল—এই নদী নাগা পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিশিয়াছে। দূরে মণিপুরের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ যাপ্‌ডো (৯৮৯০ ফিট্) নীল আকাশে মাথা তুলিয়া যেন ধ্যান করিতেছে।

পথে পড়িল মাও নামে একটি গ্রাম। এই জায়গাটীও পাহাড়ের উপর। মাও পাহাড় প্রায় ছয় হাজার ফিট উচ্চে।

ঝাকামা ও কোহিমার মধ্যে পথে নাগা পুরুষ ও নারী দেখিলাম। নাগাদের আকৃতি মঙ্গোলীয়; গায়ের রঙ্ ফর্সা; কলোও দেখা গেল। নাগা মেয়েদের মাথার চুলে বৈচিত্র্য দেখিলাম। লালতুই বলিল— কুমারী মেয়েরা মাথার চুল কপালের দিকে ছোট করিয়া ছাঁটে; বিবাহের পর মাথায় লম্বা চুল রাখে।

৬ই এপ্রিল ১৯৪৪: কোহিমার সম্মুখে:

আজ এরোপ্লেনে পর্য্যবেক্ষণ করা হইল। দূরে অভ্রভেদী পাহাড়ের উপর কোহিমা পাহাড় (৪৭৩৮ ফিট উচ্চ)। কোহিমা শহরে বেশী ভাগ বাড়ীই টিনের—খেলা ঘরের মত দেখাইতেছিল। মাঝখানে একটি বাগান রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

৭ই এপ্রিল ১৯৪৪:

আমরা কোহিমা শহরটি চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছি। এবার যুদ্ধ হইতেছে শহর দখলের জন্য। আমাদের আক্রমণকারী সেনাদলের উপর কামান দাগিতেছে। জাপানী সেনারা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

আমাদের এরোপ্লেন হইতে কোহিমার উপর বোমা ফেলা হইল।

আমাদের একদল গিয়াছে জি-টি পাহাড়ের দিকে। এই পাহাড় হইতে কোহিমা শহরে জল সরবরাহ হয়। পানীয় জল বন্ধ হইলে শহরের পতনে দেরী হইবে না।

যুদ্ধ জোর চলিয়াছে। এই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর আমাদের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

নাগা পাহাড় নিবিড় অরণ্য ও পর্ব্বতসঙ্কুল। এইরূপ স্থানে ট্যাঙ্ক ও আর্মার্ড্ কার চালানো চলে না। এরোপ্লেনের অবতরণের স্থানের অভাব। অরণ্যাচ্ছদিত পর্ব্বতের উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলিয়া বিশেষ কিছু করা যায় না। অধুরিক যুদ্ধ এখানে অসম্ভব। অসুবিধা অবশ্য উভয়পক্ষেরই।

১০ই এপ্রিল ১৯৪৪: কোহিমা:

আজ আমরা অজস্র গোলা বর্ষণ ও গ্রেনেড্ বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে কোহিমা শহরে প্রবেশ করিয়াছি। কোহিমার ডেপুটি কমিশনারের বাংলো আমাদের অধিকারে। কিন্তু শহরটি এখনো সম্পূর্ণ দখল হয় নাই।

১২ই এপ্রিল ১৯৪৪:

আজ সুখবর আছে। জি, টি পাহাড়ের জল সরবরাহের ব্যবস্থা আমাদের হাতে আসিয়াছে।

১৭ই এপ্রিল ১৯৪৪:

বৃটিশ সৈন্য ফাঁদে পড়িয়াছে। তাহাদের রসদের বেশী ভাগই দখল করিয়াছিলাম। তাহাদের খাদ্যাভাব নিশ্চয়ই হইয়াছে। তাহার উপর পানীয় জল বন্ধ; জল যাহা আছে তাহা আর কয়দিন চলিবে? ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর কাছে খানিকটা জায়গা এবং 'সামার হাউসে' অল্পসংখ্যক লোক মাত্র অবশিষ্ট আছে—বাকি সকলেই পলয়ন করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র সেনাদল এখনো বাধা দিতেছে। কাল বৃটিশ এরোপ্লেন হইতে প্যারাসুট যেগে জিনিষপত্র নামাইয়া দিয়াছে—সম্ভবত খাবার জিনিষ। আমরা বিমানটি দেখিতে পাইয়া উহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়ি; কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই উহাদের জিনিষ নামানো শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং শীঘ্রই আমাদের লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া গেল।

আজ আমাদের একদল সৈন্য একটি ঘাঁটি আক্রমণ করিল। অজস্র গুলি তাহাদের উপর বর্ষার বারিধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল। মরণ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের বীর সৈনিকগণ অগ্রসর হইল। তখন বেয়নেট লাগাইয়া কয়েকজন শত্রু সৈনিক উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রবল হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। শেষে উহারা সামার হাউসের দিকে পলায়ন করিল। আমাদের জয় হইয়াছে।

রাত্রি ১১টা। অদূরে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ। যে ঘাঁটি আমরা আজ দখল করিয়াছিলাম, তাহা ধ্বংশস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

১৮ই এপ্রিল ১৯৪৪:

আজ যুদ্ধের রিপোর্ট লইয়া হেড্ কোয়ার্টারে যাইতেছি। ইংরেজদের এক নূতন সেনাদল কোহিমার দিকে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদের সঙ্গে আছে অনেকগুলি ট্যাঙ্ক।

বর্ষায় পথগুলি কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে যানবাহন চলাচল কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য খাদ্য অস্ত্রশস্ত্র ও ঔষধ ঠিক মত আনা যাইতেছে না।

২৫শে জুন ১৯৪৪:

আজ মণিপুরের খবর বড় খারাপ। কোহিমা আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ভীষণ বর্ষা নামিয়াছে। বর্ষার জন্য কোহিমা-ইম্ফলের পথ আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে। বর্ষা শেষ না হইলে আর নূতন করিয়া আক্রমণের সুবিধা নাই।

আসামের ব্রহ্ম সীমান্তে বর্ষাকালে অসম্ভব রকম বৃষ্টি হয়।

৩০শে এপ্রিল ১৯৪৪: রেঙ্গুন:

সম্প্রতি আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের নিজস্ব ব্যাঙ্ক রেঙ্গুনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব জাতীয় ব্যাঙ্ক আছে। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক আমাদের একটা বড় অভাব পূর্ণ করিয়াছে।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের কাজ এতদিন চলিয়াছে প্রবাসী ভারতবাসীদের দানে। কিন্তু এইভাবে কোন রাষ্ট্র চলিতে পারে না, বিশেষতঃ আমাদের শ্রেষ্ঠ দুইটি শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। পূর্ব্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতবাসী মাত্রেই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের প্রজা। তাহাদের নিকট হইতে নিয়মিত ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়ছে। এই সব টাকা রাখিবার জন্য জাতীয় ব্যাঙ্ক আবশ্যক। ব্যাঙ্কে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। শ্রীদীননাথ ব্যাঙ্কের একজন প্রধান উদ্যোগী।

৪ঠা জুলাই ১৯৪৪:

আরাকান ও মণিপুরের যুদ্ধ সফল হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ প্রবল বর্ষা।

গত যুদ্ধে কয়েকজন অফিসার ও সৈনিক অদ্‌ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছেন। আজ নেতাজী তাহাদের পদক পুরস্কার দানে সম্মানিত করিলেন। কর্ণেল এল্‌-এস্‌ মিশ্র পাইলেন সর্দার-ই-জঙ্গ্‌ পদক এবং লেফটন্যান্ট পিয়ারী সিংহ পাইলেন বীর-ই-হিন্দ পদক।

নেতাজী বলিলেন—'আজ লেফটন্যান্ট পিয়ারী সিংহকে পদকদানে সম্বর্দ্ধিত করিয়া আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। শুধু আমিই নয় আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টও ইহাতে গৌরবান্বিত হইয়াছেন'।

আজ রেডিওতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের আবেদন শুনিলাম:

"মহাত্মাজী, ব্রিটিশ কারাগারে শ্রীমতী কস্তুরবাই-এর মৃত্যুর পর আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসীর উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। বহির্ভারতের মধ্যে মতের পার্থক্য অনেকখানি ঘরোয়া মতদ্বৈতের ন্যায়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে যখন আপনি স্বাধীনতা বিপ্লব সুরু করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সকল সভ্যই তাহাদের সকলের মনে কেবল এক আশাই পোষণ করেন। বহির্ভারতেব ভারতীয়গণের নিকট আপনিই আমাদের দেশের বর্ত্তমান জাগরণের জন্মদাতা।····

বহির্ভারতের দেশপ্রেমিক ভারতীয়গণ এবং ভারতের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বৈদেশিক বন্ধুগণ আপনাকে উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে। ১৯৪২ সালে আগষ্ট মাসে দুর্জয় সাহসের সঙ্গে আপনি যখন ভারত ত্যাগ করার আন্দোলন করিলেন তখন উহা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। চক্রশক্তি সম্বন্ধে আমার কেবল একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর দিবার আছে। তাহাদের দ্বারা আমার প্রবঞ্চিত হওয়া কি সম্ভব হইতে পারে? ইহা আমার বিশ্বাস, সকলেই একথা স্বীকার করিবেন—সর্ব্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত এবং চতুর রাজনীতিবিদ ব্রিটিশদের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদগণ আমাকে খোঁচাইয়া বা আমার উপর জোরজুলুম করিয়াও আমাকে বশীভূত করিতে পারে নাই তখন আর কোন বাজনীতিবিদ্‌ই উহা করিতে সমর্থ হইবে না এবং যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট আমাকে বহুবার কারাজীবন বরণ করিতে হইয়াছে, কত

অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে, উহা যখন আমাকে নৈতিক পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই তখন অন্য কোন শক্তিই আর উহা করিতে পারিবে না। আমার দেশের মর্য্যাদা, আত্মসম্মান অথবা স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এইরূপ কোন কার্য্যই আমি কখনও করি নাই।

মহাত্মাজী, ভারতীয়গণ কেবল প্রতিশ্রুতিকে কতখানি সন্দেহের চক্ষে দেখেন উহা অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা আপনি অনেক ভাল জানেন। জাপানের ঘোরণা যদি কেবল প্রতিশ্রুতিই হইত, তাহা হইলে আমি কখনও জাপানীদের কথায় বিশ্বাস করিতাম না।

মহাত্মাজী, আমরা এখানে যে সাময়িক গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এইবার উহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাময়িক গভর্ণমেন্টের লক্ষ্য এক—ভারতের স্বাধীনতা। আমাদের প্রচেষ্টা, আমাদের দুঃখকষ্ট এবং আমাদের উৎসর্গের জন্য আমরা একটা মাত্র পুরস্কার চাই; উহা হইতেছে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। আমাদের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাহারা ভারতের স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে চান। ভারতে অবস্থিত আমাদের স্বদেশবাসী যদি কোন উপায়ে তাহাদের নিজের চেষ্টায় নিজেদের মুক্ত করিতে পারে অথবা যদি কখন ব্রিটিশ সরকার আপনার "ভারত ত্যাগ কর" প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমাদের অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তিই অধিক সুখী হইবে না। যাহা হউক, উপরোক্ত কোনটিই সাফল্যলাভ করিবে না এবং সংগ্রাম অনিবার্য্য ইহা ধরিয়া লইয়া আমরা কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি।

হে আমাদের জাতির পিতা! ভারতের স্বাধীনতার এই পবিত্র সংগ্রামের সময় আমরা আপনার আশীর্ব্বাদ ও শুভ কামনা প্রার্থনা করি।'

১লা আগষ্ট ১৯৪৪:

অমর মণিপুর ও কোহিমা অধিকার করিয়াছিলাম। কিন্তু ভারতের মাটিতে পদার্পণ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। মণিপুরে আমাদের অভিযানের ব্যর্থতা অনেকের মনে হতাশা র সৃষ্টি করিয়াছে। মণিপুরে বর্ষার ফলে রণক্ষেত্রের রাস্তা কর্দমে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় সৈন্য চলাচল এবং খাদ্য ও অস্ত্রাদি প্রেরণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহার উপর আকাশ হইতে বিমান বাহিনীর সাহায্য পাইলে আমাদের বীর সৈনিকদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইত না। আজ নেতাজীর বিবরণ লোকের মনে পুনরায় অংশার সঞ্চার করিয়াছে—অমাদের নূতন অভিযান শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। নেতাজী বলিয়াছেন:—

‘আজাদ হিন্দ বাহিনীর অগ্রবর্ত্তী দলগুলি ১৯৪৪ সানের মার্চ মাসে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে। সুতরাং এখন ভরিতের স্বাধীনতার জন্য ভারতের মাটিতেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

‘ব্রিটিশগণ এক শতাব্দীর অধিক কাল ভারতকে অধীন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের হইয়া লড়িবার জন্য বিদেশী সৈন্য আমদানী করিয়াছেন। এই প্রকারে আমাদের বিরুদ্ধে এক প্রবল শক্তিশালী বাহিনী নিযুক্ত হইয়াছে। আমাদের সৈন্যরা আমাদের দাবীর যৌক্তিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভারত ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রমের পর অধিকতর সুসজ্জিত বিভিন্ন জাতীয় শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছে এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তাহাদের পরাজিত করিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে আমাদের সৈন্যরা অধিকতর সুশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। স্বাধীনতা লাভের জন্য মৃত্যুপণ করিয়া অটল সঙ্কল্প লইয়া তাহারা অনায়াসে শত্রুপক্ষ অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। প্রত্যেকবার পরাজিত হওয়ায় শত্রুর মনোবল ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

‘অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যেও যুদ্ধ করিয়া আমাদের অফিসার ও সৈন্যগণ অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং সকলের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। দেহের রক্ত এবং জীবন দান করিয়া এই সকল বীর যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ভারতের ভাবী সৈনিকগণকে তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

‘যখন ইম্ফল আক্রমণের আয়োজন সমস্ত ঠিক, সেই সময় প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং রণকৌশলের দিক হইতে ইম্ফল আক্রমণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির ফলে আমাদের আক্রমণ স্থগিত রাখিতে হয়।

আক্রমণ স্থগিত রাখার পর দেখা গেল যে, আমাদের সৈন্যগণ যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেগুলি দখল করিয়া রাখা অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর অনুকূল স্থান লাভের জন্য আমাদের সৈন্যদের সরাইয়া লইবার প্রয়োজন দেখা যায়।

‘এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের সৈন্যগণকে আত্মরক্ষার পক্ষে অধিকতর অনুকূল স্থানে সরাইয়া লইয়া আসা হইয়াছে।

‘যুদ্ধ বিরতির এই সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের আয়োজন এমন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব, যে আবহাওয়া ভালো হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পুনরায় আক্রমণ করিতে পারিব।

‘যুদ্ধক্ষেত্রের কয়েক অংশে শত্রুকে একবার পরাজিত করিবার পব, চূড়ান্ত জয়লাভ এবং আক্রমণকারী ইঙ্গ মার্কিন সৈন্যদলের ধ্বংসসাধন সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইবামাত্র আমরা পুনরায় উন্নততর রণনৈপুণ্য, অদম্য সাহস এবং আমাদের অফিসার ও সৈন্যদের কর্ত্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা লইয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইব। জয়লাভ আমরা নিশ্চয়ই করিব।

‘এই যুদ্ধে আমাদের যে সকল বীর নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরলোকগত আত্মা ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের সংগ্রামের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মাদিগকে আরও বীরত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে উৎসাহিত করিবে।’

৫ই আগষ্ট ১৯৪৪:

আজ সিঙ্গাপুর হইতে লেফটন্যান্ট মূর্ত্তি আসিয়াছেন। তিনি আমায় বলিলেন—‘তুমি টোকিও মিলিটারী একাডেমীর শিক্ষার সুযোগ লইলে না। এরূপ সুযোগ খুব কমই আসিবে। বৃদ্ধ না হইলে আমি যাইতাম।’

তাঁহার নিকট জানিলাম, গত ১০ই মার্চ শিক্ষার্থীদের প্রথম দল টোকিও গিয়াছে; সেই দলে ৩৫ জন ছিল। ইহারা টোকিও মিলিটারী একাডেমী এবং বিমান বাহিনী শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। আগামী মাসে আরও ১৫ জন যাইবে।

৭ই আগষ্ট ১৯৪৪:

আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কে আজ টাকা আনিতে গিয়াছিলাম। ব্যাঙ্কের কাজ খুব ভালো চলিতেছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্কের অভাবে অসুবিধা হইতেছিল; এখন সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে। বর্মীরা পর্য্যন্ত এই ব্যাঙ্কেই টাকা রাখা বেশী নিরাপদ মনে করে।

ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারীর নিকট জানিলাম-ব্যাঙ্কে অজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টেরই জমা আছে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ডলার; তাহা ছাড়া সাধারণের আমানত জমা আছে।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট স্থাপনের পর হইতে এদেশে ভারতীয়দের সম্মান এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে ইহারা ছিল এদেশে নিরুপায় প্রবাসী—সহায়হীন। বিদেশী রাষ্ট্রের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত এবং লুণ্ঠন ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষার কেহ ছিল। আজ আর সে দিন নাই। প্রবাসী ভারতবাসী আজ সঙঘবদ্ধ ও শক্তিশালী। অনেক ভারতীয় ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

২০শে অক্টোবর ১৯৪৪: তাদাগালে:

আজ রেঙ্গুন হইতে মিংগালাদন্ যাইতে হইবে। দুই ঘণ্টার ছুটি লইলাম। রেঙ্গুন হইতে মিংগালাদন্ মাত্র ১২ মাইল। পথে পড়ে তাদাগালে। একবার তাদাগালে যাইব; অং ফয়ার খবর অনেক দিন পাই নাই। আজ তাহার কথা অনবরত মনে পড়িতেছে।

তাদাগালে পৌছিয়া ফয়ার দিদিমার কুটীরের দিকে চলিলাম। ফয়া আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইবে; তাহার নিশ্চয়ই অভিমান হইবে এতদিন কোন খবর না লওয়ার জন্য। মনে মনে ঠিক করিয়া লইলাম, কি উত্তর দিব।

কুটীরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। কুটীরের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—উপরে চাল নাই। চারিধার নির্জ্জন—জন মানবের চিহ্ন নাই। পাশাপাশি সব বাড়ীগুলিরই অবস্থা এইরূপ। ইহাদের কি হইল—কোথায় গেল—কোন খবর পাইলাম না।

বিষণ্ণ মনে তাদাগালে ত্যাগ করিয়া মিংগালাদনের দিকে চলিলাম।

২১শে অক্টোবর ১৯৪৪: মিং গালাদন্:

অজাদ হিন্দ্ ফৌজের এক বিরাট সমাবেশ হইয়াছে। সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে। নেতাজী আসিয়াছেন।

প্রথম পদাতিক বাহিনীর প্যারেড্ হইল। নেতাজী স্যালিউট্ গ্রহণ করিলেন। এমন সময় সাইরেন্ বাজিয়া উঠিল! শত্রুবিমান আসিয়া পড়িয়াছে।

আকাশে বিমানগুলি দেখা গেল অনেক উপরে। বিমান হইতে আমাদের তাঁবুর উপর মেসিন্ গানের গুলি বর্ষণ আরম্ভ হইল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁবুগুলিতে কেহ ছিল না।

জাপানী জঙ্গী বিমানগুলি সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে উঠিয়াছে। ইহারা শত্রু বিমানকে আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষারত শত্রু বিমান হইতে গুলিবর্ষণ বন্ধ হইয়া গেল।

আযাদের সৈন্যেরা নীরবে ট্রেঞ্চে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সাইরেন বাজিতেই সেনানায়ক নেতাজীকে ট্রেঞ্চে আশ্রয় গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

তিনি বলিলেন—‘সমস্ত সৈনিক যতক্ষণ না ট্রেঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি এইস্থান হইতে নড়িব না।’

শেষ সৈনিকটি ট্রেঞ্চে নামিবার পর নেতাজী নিজেও তাহাদের সহিত একই ট্রেঞ্চের মধ্যে গিয়া বসিলেন।

আকাশে শত্রু ও জাপানী এরোপ্লেনে যুদ্ধ চলিতেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আক্রমণকারী এরোপ্লেনগুলি পলাইয়া গেল। জাপানীদের দুইখানি এরোপ্লেন নষ্ট হইল।

আমাদের কেহই হতাহত হয় নাই। কেবল দুটি তাঁবু নষ্ট হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারি ১৯৪৫:

আজ ফতে সিং-এর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি যুদ্ধ আরম্ভের সময় জার্ম্মানিতে ছিলেন এবং গতমাসে জাপান হইয়া এখানে আসিয়াছেন। ইহার নিকট হইতে জার্ম্মানি ও ইটালিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ-ইতিহাস শুনিলাম। এই সেনাদল জার্ম্মানিতে গঠন করেন নেতাজী।

জার্ম্মানি ও অষ্ট্রীয়ায় কয়েকজন ভারতীয় যুবক অধ্যয়নের জন্য ছিলেন; যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইহারা আটক পড়িয়া যান। ইতিমধ্যে বিজয়ী জার্ম্মান বাহিনীর হাতে বহু ভারতীয় সৈনিক বন্দী হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্র ভারত হইতে পলায়ন করিয়া যখন জার্ম্মানীতে উপস্থিত হইলেন, তখন এই সকল ভারতবাসীকে লইয়া এক সেনাদল তাঁহার নেতৃত্বে গড়িয়া উঠিল। ইহার নাম হইল স্বাধীন ভারত বা ফ্রিস্ ইণ্ডিয়েন্। জার্ম্মানীর কোনিগস্বর্গে ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের যে সমাবেশ হইয়াছিল নেতাজী তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে একদল ভারতীয়কে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করা নেতাজীর উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে যুদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষার যে অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, হিটলারের সহায়তায় নেতাজী তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। যদি সুযোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে এই সেনাদল ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিবে।

সুভাষচন্দ্র জার্ম্মানিতে যে স্বাধীন ভারত গর্ভর্ণমেন্টর সূচনা প্রতিষ্ঠা করেন তাহা কাহারও অধীন ছিল না। ভারতবর্ষ চায় শুধু নিজের স্বাধীনতা; জার্ম্মানির পররাজ্য গ্রাস প্রচেষ্টায় সহায়তা ভারত করিবে না। কেবলমাত্র ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফ্রিস্ ইণ্ডিয়েন্ সৈন্যদল ব্যবহৃত হইয়াছিল। রুশিয়ায় পর্য্যন্ত এই সেনাদল পাঠাইতে দেওয়া হয় নাই। এই সেনাবাহিনীর নীতির উপর হিট্লার বা মুসোলিনীর কোন প্রভাব ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'ইউরোপে ফ্রিস্ ইণ্ডিয়েন্ বাহিনীতে সৈন্য কত ছিল?'

'প্রথমে যখন ১৯৪২ সালের ২৬ শে জানুয়ারি তারিখে এই বাহিনী গঠিত হয়, তখন সৈন্য বেশী ছিল না; বোধ হয় দেড় হাজার হইবে। কিন্তু পরে বাড়িয়া ঐ সংখ্যা হয় প্রায় পাঁচ হাজার। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে তোবরুকে

বন্দী ভারতীয় সৈনিকেরা ইটালী ও জার্ম্মানিতে স্থানান্তরিত হয়; তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের ফৌজে যোগ দিয়াছিলেন।'

'আপনারা কি শুধু জার্ম্মানিতেই ছিলেন?'

'আমরা ইউরোপের বিভিন্ন রনাঙ্গনে ছড়াইয়া ছিলাম। আমাদের বেশীভাগ ছিল ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং হল্যাণ্ডে। ইটালীতেও আমাদের একটি ছোট দল ছিল। লেফট্‌ন্যান্ট যশোবন্ত সিং সিদ্ধা ইটালীতে ছিলেন। আমরা মার্কিন, ইংরেজ ও ক্যানাডিয়ান বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করি। লেফটন্যান্ট আলি খাঁ গত বৎসর (১৯৪৪) আগষ্ট মাসে জেনারেল দ্য গলের বাহিনীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।'

'রোম রেডিও হইতে বন্দে মাতরম গান এবং ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় প্রচার শুনিতাম। ইহা কি আপনারা করিতেন?

'আমাদের ফ্রিস্‌ ইণ্ডিয়েনের প্রচার বিভাগ হইতে ভারতবাসীর নিকট রেডিওর সাহার্য্যে প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। বার্লিন ও রোম হইতে বেতার বক্‌তৃতা হইত। মধ্যে মধ্যে নেতাজী নিজে বক্‌তৃতা করিতেন। তাঁহার বক্‌তৃতাগুলির রেকর্ড তৈরী করা হইয়াছিল; অধিকাংশক্ষেত্রে রেকর্ড বাজানো হইত। ইটালীতে প্রচার বিভাগের ভার ছিল লেফট্‌ন্যান্ট জামিল্‌ খাঁর উপর। লেফট্‌ন্যান্ট ওরবচান সিংও প্রচার বিভাগের একজন কর্ত্তা ছিলেন।'

'আপনাদের সৈন্যেরা কি জার্ম্মান বা ইটালীয় বাহিনীর মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতেন?'

'ফ্রিস্‌ ইণ্ডিয়েন্‌ সেনা বাহিনী স্বতন্ত্র ইউনিট ছিল। আমাদের সেনাদলে এই কয়টি বিভাগ ছিল:—

(ক) ক্ষুদ্র অস্ত্রসজ্জিত দল—তিনটি

(খ) বৃহৎ অস্ত্র সজ্জিত দল—একটি

(গ) ট্যাঙ্ক-ধ্বংশকারী ভারী কামান সজ্জিত দল—একটি

(ঘ) পদাতিক গোলন্দাজ দল—একটি

(ঙ) স্যার্পাস্‌ ও মাইনার্স দল—একটি।

‘আপনাদের মধ্যে আপনিই কি কেবল এখানে আসিয়াছেন?’

‘আমি ও আরও কয়েকজন বার্মায় আসিয়াছি। আমাদের মধ্যে লেফ্‌টন্যান্ট হাসান নেতাজীর সঙ্গেই ছিলেন।’

‘নেতাজী কি ইউরোপ হইতে ভারত আক্রমণের কল্পনা করিয়াছিলেন?’

জার্মানী চাহিয়াছিল তড়িৎগতিতে মিশর দখল করিয়া অগ্রসর হইতে। মধ্য প্রাচ্যে যদি জার্মানী ও ইটালী জয়লাভ করিত তাহা হইলে এই সকল সুশিক্ষিত সেনাদল ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া কাজ করিতে পরিত। নেতাজী যখন দেখিলেন যে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নয়, তখন তিনি জার্ম্মানি হইতে জাপানে আসিলেন। জাপান পূর্ব্বেই ভারতের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখান হইতে চেষ্টা করাই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। হিট্‌লারের সহায়তায় ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে নেতাজী একখানি সাব্‌মেরিনে করিয়া জার্ম্মানী হইতে টোকিও আসেন।’

‘তিনি কি একা আসেন?’

‘তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কর্ণেল হাসান্‌, লেফ্‌টন্যান্ট গোলাম হায়দার এবং ওয়ালি মহম্মদ। এখানে আসিবার পর ইহাদের কাহারও সহিত আমার আর দেখা হয় নাই।’

ফতে সিং-এর নিকট হিটলারের সহিত নেতাজীর সাক্ষাতের একখানি সুন্দর ফটো দেখিলাম।

৭ই জানুয়ারী ১৯৪৫:

আজ সকালে প্যারেডে কর্ণেল প্রেম কুমার সেহগল্ বক্তৃতা দিলেন। শুনিলাম—ইনি লাহোর হাইকোর্টের জজ অচ্ছুরামের পুত্র এবং দেরাদুন্ মিলিটারি স্কুলে সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

সেহ্গল বলিলেন—তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি যে রেজিমেন্টের ভার পাইয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই রণক্ষেত্রে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। তিনি সকলের সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাইয়া বলিলেন যে যদি কোন অফিসার বা সৈনিকের কোন অভাব অভিযোগ থাকে তিনি তাহা দুর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

আজ সন্ধ্যায় অফিসারদের একটি আলোচনা সভা হইল। নেতাজী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ বিভাগের কর্ম্মচারী বলিলেন যে সম্প্রতি বাঙলা ও আসামে আমাদের যে বিমান পর্য্যবেক্ষণের জন্য গিয়াছিল তাহার অফিসারের রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে আমেরিকার প্রচুর সমরোপকরণ, এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, মোটার, মোটর সাইকেল, কামান প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং বার্ম্মার সীমান্তে চালান হইতেছে। অন্যান্য সূত্র হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে বৃটিশ ও আমেরিকার সৈন্যসংখ্যা ২০ লক্ষের কম নয়।

বার্ম্মায় জাপানীদের আড়াই লক্ষের বেশী সৈন্য নাই এবং তাহাদের এরোপ্লেন ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ইহার তুলনায় কিছুই নয়! জাপানীরা খুব কম সৈন্য ও এরোপ্লেনের সাহায্যে সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা সম্ভব হইয়াছিল শুধু এইজন্য যে তখন ইংরেজদের এই অংশে কিছুই ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা পৃথক আকার ধারণ করিয়াছে। তখন ভারতবর্ষও প্রায় অরক্ষিত ছিল—বাঙলা ও আসাম হইতে ইংরেজরা সরিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছিল; যুদ্ধেরও প্রয়োজন হইত না। আজ এক শক্তিশালী যান্ত্রিক বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত রহিয়াছে।

নেতাজী বলিলেন—‘যন্ত্র অপেক্ষা মানুষই বেশী শক্তিশালী। আরাকান, চিন্ ও নাগা পাহাড় অঞ্চলে যান্ত্রিক বাহিনী বিশেষ কাজে লাগিবে না। বৃটিশ সৈন্যের মনোবল নষ্ট হইয়াছে। একবার আসাম ও বাঙলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে দেশের লোক আমাদের সাহায্য করিবে। এখনো আমাদের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।’

এই সময় গত বৎসরের যুদ্ধে যে সকল সৈন্য দল ছাড়িয়া বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের কথা উঠিল।

নেতাজী বলিলেন—‘আমাদের ফৌজ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। আমরা সকলে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় চলিয়াছি আত্মদান করিবার জন্য —অর্থ বা পুরস্কারের প্রলোভনে নয়। আমাদের মধ্যে যদি কেহ এই দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য ও মৃত্যুর সম্ভাবনায় ভয় পায়, তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধে পাঠানো না হয়।’

৮ই জানুয়ারি ১৯৪৫: মিংগালাদন্:

আজ সকালে প্যারেডে নেতাজী উপস্থিত ছিলেন। রণাঙ্গনে যাত্রার পূর্বে তাঁহার বাণী দিলেন:—

‘গত বৎসর আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম রণক্ষেত্রে বিপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিল। রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহা গৌরবময় এবং আমার আশার অতীত। তাহারা শত্রু ও মিত্র সকলেরই প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আমরা যখনি যেখানে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি, সেখানেই তাহাদের পর্যুদস্ত করিয়া পরাজিত করিয়াছি। আমরা পরাজিত হই নাই; অসম্ভব বৃষ্টি এবং অন্যান্য বাধাবিঘ্নের ফলে আমরা রণকৌশলের খাতিরে ইম্ফল রণাঙ্গন হইতে আমাদের সেনাবাহিনী ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হই।

‘আমরা এক্ষণে এই সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিতেছি।

‘এই বৎসর যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণীত হইবে। ইম্ফল্ পর্বতমালা ও চট্টগ্রামের সমতলভূমিতে ভারতের স্বাধীনতা ও আমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে।

‘গত বৎসর আমাদের কিছু লোক শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। আমরা যখন রণাঙ্গণে যুদ্ধে রত থাকিব, তখন আমি চাহি না যে একজনও বিপক্ষে চলিয়া যায়। সুতরাং যদি কেহ মনের দৌর্বল্য, কাপুরুষতা বা অন্য কোন কারণে রণাঙ্গনে যাইতে অক্ষম বলিয়া মনে করে, সে যেন তাহার রেজিমেন্টের কমাণ্ডারের নিকট তাহা বলে; তাহা হইলে তাহাকে অন্য কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে।’

‘আমি তোমাদের কাছে কুসুমাচ্ছাদিত স্বপ্নের কাহিনী চিত্রিত করিতে চাহি না। যখন তোমরা রণাঙ্গনে উপস্থিত হইবে তখন তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য দুঃখকষ্ট এবং এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে হইতে পারে। আমাদের বিপক্ষ যতদূর সম্ভব তৈয়ারী হইয়াছে; আমাদের সমস্ত সম্বল নিযুক্ত করিতে হইবে—

‘সব ত্যাগ কর—সব দিয়া ফকির হও।’

নেতাজীর কণ্ঠস্বরে যাদু আছে; তাঁহার বাণী সকলের মনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫: পোপা

আজ পোপায় পৌছিয়াছি। পোপা পর্বত ৪৯৩১ ফিট উচ্চ; উত্তর বর্মার মিঙ্গিয়ন জেলার দক্ষিণে। আমরা যেখানে আছি, সেখান হইতে পোপার সর্ব্বোচ্চ শিখর অনেক দূর।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫:

গতকল্য কর্ণেল ধীলন এখানে আসিয়া পোঁছিয়াছেন। তাঁহার নেহরু রেজিমেন্টের অবস্থা বড় খারাপ—অনেকের বন্দুক নাই, আবার অনেকের সঙ্গে বিছানা বা গরম কাপড়ও নাই। এই রেজিমেন্টের প্রায় তিনশত লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে আসিয়া পৌছিয়াছে।

আজ কর্ণেল সেহগল আসিলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫:

আজ সকালে কিয়ঙ্‌ক্ পদাউঙ্গ শহরে পৌঁছিয়াছি। এখান হইতে সংবাদ লইয়া এরোপ্লেনে যাইতে হইবে নেতাজীর অফিসে।

বৃটিশ বাহিনী বর্মার উপর জোর আক্রমণ চালাইয়া অগ্রসর হইতেছে। মান্দালয় পৌছিয়া শুনিলাম—নেতাজী টউঙ্গগি গিয়াছেন।

এখানে কর্ণেল সেহগলের রণাঙ্গন হইতে একজন অফিসার আসিয়ছেন। তাঁহার নিকট জানিলাম—ইংরেজ সৈন্য কর্ণেল ধীলনের রণাঙ্গনের একস্থানে গত ১৭ই তারিখে ইরাবতী নদী পার হইয়াছে। কর্ণেল

ধীলনের রেজিমেন্টের মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। সৈন্যরা কাহারও কথা শুনিতেছে না; তাহাদের মনোবল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেকে পলায়ন করিয়াছে। এদিকে কর্ণেল আজিজ অসুস্থ। কর্ণেল শাহ নওয়াজ আজিজের রেজিমেন্ট পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিয়াছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫; টউঙ্গি:

নেতাজী কাল দক্ষিণ সান্ রাজ্যের রাজধানী টউঙ্গি পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আরও দুইদিন এখানে থাকিবার কথা ছিল। আমাদের রিপোর্ট পাইয়া তিনি আজ রাত্রেই রণাঙ্গণে যাত্রা করিলেন।

নেতাজীর ব্যক্তিগত স্টাফের সহিত আমি থাকিয়া গেলাম। আমাদের উপর আদেশ হইয়াছে কাল কাগজপত্র লইয়া এরোপ্লেনে রেঙ্গুনে ফিরিতে। টউঙ্গি রেল ষ্টেশন হইতে অনেক দূর—প্রায় ১০৫ মাইল।

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫:

আজ দুপুর বেলা সাইরেন্ বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বোমাবর্ষণ।

বোমা বর্ষণ শেষ হইয়া গেলে বাহির হইয়া দেখিলাম—শত্রুর লক্ষ্য ছিল সরকারী বাড়ীগুলির উপর। একটি বাড়ী ধ্বংশস্তূপে পরিণত হইয়াছে—শুনিলাম একজন বৈমানিক ধরা পড়িয়াছে এবং সে নাকি বলিয়াছে যে তাহারা খবর পাইয়াছিল যে সুভাষ বসু এখানে আছেন! তিনি যে কাল চলিয়া গিয়াছেন, তাহা তাহারা জানিত না বলিয়াই রক্ষা।

৫ই মার্চ ১৯৪৫: পোপা

দুইদিন হইল আবার পোপা অঞ্চলের হেড্ কোয়ার্টারে আসিয়াছি। কর্ণেল শাহ নওয়াজ এখানে আছেন।

কাল (৪ঠা মার্চ্) বিপক্ষের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আবদুল্লা খাঁ একটি বৃটিশ পেট্রল দেখিতে পায়। যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হইয়াছে এবং দুইটি জিপ্ মোটার এবং একটি বেতার যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। হতাহত সামান্যই।

১৪ই মার্চ্ ১৯৪৫: প্যিন্‌বিনের দিকে।

আজ কর্ণেল সেহগল দুই কোম্পানি সিপাহী লইয়া প্যিনবিন্ আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। যাত্রার পূর্বে কর্ণেল শাহ নওয়াজ বলিলেন—

‘আপনাদের ২ নং রেজিমেন্ট, এই প্রথম শত্রুর সহিত সংঘর্ষে চলিয়াছে। সকলের দৃষ্টি আপনাদের উপর নিবদ্ধ থাকিবে। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে আমাদের বিপক্ষ ভীরু। আমি আশা করি যে ভারতমাতার সুনামে আপনার কলঙ্ক আনিবেন না। আমাদের শুভ কামনা আপনাদের সঙ্গে থাকিবে।’

দুইটি সেনাদল ম্যেনে পৌঁছিবার পর, উহার একদল আক্রমণের জন্য তৌঙ্গনের পশ্চিমে প্রেরিত হইল। আর একদল শত্রুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। এই দল যখন তৌঙ্গনের্ পূর্বে পৌঁছিল তখন হঠাৎ আমাদের উপর বোমা ও গুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের সঙ্গে একদল জাপানী সৈন্য ছিল। আক্রমণ হইতেই তাহারা পলায়ন করিল। আমাদের নিষেধ তাহারা শুনিল না। আমরা পাল্‌টা গুলি চালাইলাম। ইহাতে শত্রু দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। আমাদের উপর আদেশ ছিল প্রধান বাহিনীর দিক হইতে শত্রুর দৃষ্টি বিভ্রান্ত করা; সুতরাং আমরা তাহাদের পশ্চাদনুসরণ যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না।

মুহম্মদ হুসেন্ ইংরেজ্ পক্ষে যোগদানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; সে আরও কয়েকজনকে দলে টানিতে চেষ্টা করে। হুসেন দোষ স্বীকার করিল। কর্ণেল সেহ্‌গল্ অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। তাহাদের তিন জনকে ডিভিসনাল্ হেড্ কোয়ার্টারে পাঠানো হইল।

১৫ই মার্চ ১৯৪৫:

কর্ণেল্ শাহ নওয়াজের রণাঙ্গন হইতে যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহা ভালোই। গত ১৬ই তারিখে আমাদের সৈন্যদল দুইটি পাহাড় দখল করিয়াছে। খান মুহম্মদ পাহাড়ের উপর ইংরেজদের এই ঘাঁটি আক্রমণে নেতৃত্ব করেন। তখন রাত্রি তিনটা। তীব্র হাতাহাতি যুদ্ধের পর শত্রু পরাজিত হয়। শত্রুপক্ষে প্রায় ২০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে। আমাদের দিকে হত হইয়াছে মাত্র ২ জন, আর আহতের সংখ্যা ১০ জন।

আজ ব্যানার্জির মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম। পোপায় একটি খণ্ডযুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আজ আর কিছু ভালো লাগিতেছে না।

১৯শে মার্চ ১৯৪৫:

আজ কর্ণেল ধীলনের নিকট হইতে সুসংবাদ আসিয়াছে। একটা যুদ্ধে আমাদের সৈনিকরা অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছে। নেতাজীর নিকট রিপোর্ট যাইতেছে। জ্ঞান সিংএর সহিত পরিচয় ছিল। তাহার মৃত্যু সংবাদে মন খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু এ মৃত্যু বীরের।

ঙগ্লাইঙ্গের নিকটে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট কর্ত্তার সিংএর অধীনে একদল এবং কন্‌জাউঙ্গের উত্তর-পূর্বে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট জ্ঞান সিংএর অধীনে একদল সৈন্য ছিল। নিকটেই ছিল একদল জাপানী সৈন্য; তাহার নায়ক—কাপ্তেন মিদোরি কাওয়া।

গত ১৪ই মার্চ সন্ধ্যা ৮॥০টার সময় শত্রু কামান উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভীষণ গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।

‘এ’ কোম্পানীর একটি পেট্রল লইয়া হাভিলদার নজর সিং ন্যায়ুঙ্গ্ অভিমুখে যাইতেছিলেন। সেই সময় শত্রুর একটি প্লেটুন্ রাস্তার পশ্চিম দিকে ঙগ্লাউঙ্গেব দিক হইতে আসিতেছে দেখা গেল। ইহারা আমাদের পেট্রল দলটী দেখিতে পাইয়া গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল।

নজর সিংএর দল তাহার উত্তরে গুলিবৃষ্টি করিল। সাতজন শত্রু সৈনিক নিহত হইল। শত্রুর অগ্রগতির সংবাদ নজর সিং ‘এ’ কোম্পানির হেড কোয়ার্টারে পাঠাইলেন।

কমাণ্ডার কর্ত্তার সিং শত্রুকে বাধা দিবার জন্য সেকেণ্ড লেফ্‌ট্‌ন্যান্‌ট্ দিত্‌তুরামকে পাঠাইলেন। দিত্‌তুরাম শত্রুকে বাধা দিলেন।

প্রায় ১২-৩০টার সময় শত্রুর ১৫টী ট্যাঙ্ক, ১১টি আর্‌মার্ড্ কার এবং দশখানি ট্রাক আসিয়া ঐখানে উপস্থিত হইয়া গুলি ও বোমা বর্ষণ আরম্ভ করিল। আমাদের লোকেরা ব্রেন্ গান্ ও রাইফেলের গুলি দিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল।

শত্রু সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদল ‘এ কোম্পানীকে এবং অন্য দল ‘বি’ কোম্পানীর দিকে অগ্রসর হইল।

‘বি’ কোম্পানী পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিল। শত্রুর যান্ত্রিক বাহিনী বি কোম্পানীকে ভেদ করিয়া পর্যুদস্ত করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমাদের সৈন্যদল প্রস্তুত থাকায় তা আর হইল না। তাহারা গাড়ী হইতে আমাদের ছাউনির উপর বোমা ফেলিতে ও কামান ছুঁড়িতে লাগিল। শত্রুর উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির নিকট আমাদের সৈন্যরা হতাশ হইয়া পড়িল। দুইটি মাইন্ ছিল; সে দু’টি ছোঁড়া হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুটিরই লক্ষ্য বিফল হইল।

তখন ৫ ও ৬ নং প্লেটুন্ পরিখার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং নেতাজীর জয় ও ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ ধ্বনির সহিত বেয়নেট হস্তে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। শত্রুর মোটার বাহিনীর গতি রুদ্ধ হইল। শত্রু মোটার হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন এক ঘণ্টা কাল হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল। কম্যাণ্ডার জ্ঞান সিং নিজেই সৈন্যদের মধ্যে থাকিয়া আক্রমণ চালাইতেছিলেন এবং তাহাদের উৎসাহিত করিতেছিলেন।

৫ নং প্লেটুনের কম্যাণ্ডার সেকেণ্ড্ লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট মঙ্গুরাম নিহত হইলেন এবং দুটি প্লেটুনের মধ্যে দশমাংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন জ্ঞান সিং ৪ নং প্লেটুন কমাণ্ডার সেকেণ্ড্ লেফ্‌ট্‌ন্যান্‌ট্ রাম সিংকে ডাকিলেন। তিনি যখন আদেশ দান করিতেছিলেন, সেই সময় একটি বুলেট্ আসিয়া লাগিল এবং তিনি পড়িয়া গেলেন।

জ্ঞান সিংএর মৃত্যুর পর একটু গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু রাম সিং তখন পরিস্থিতি আয়ত্তে আসিয়া কোম্পানির অবশিষ্ট সৈনিকদের একত্র করিলেন।

এই সময়ে শত্রু তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া স্থান ত্যাগ করিল। এই যুদ্ধ ১৪টা হইতে ১৬টা (২টা হইতে ৪টা) পর্য্যন্ত চলে। শত্রুপক্ষে ক্ষতি—৫০ জন হত এবং অনেক আহত।

শত্রুর যে দল ‘এ’ কোম্পানীর নিকটে আসিয়াছিল, তাহা গ্রামের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে এবং গ্রামের মধ্যে প্রবেশে সক্ষম হয়। আমাদের কোম্পানির দিক হইতেও অগ্নিবর্ষণ করা হইল। প্রায় ১৮টার সময় (সন্ধ্যা ৬টা) শত্রু বেয়নেট্ ও টমি গান লইয়া আক্রমণ করিল।

জাপানীরা তখন ট্যাঙ্কের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল। ইহাতে সুবিধা হইল এই যে ট্যাঙ্কগুলি আর অগ্রসর হইতে পারিল না এবং শত্রুকে বাধ্য হইয়া পলায়ন করিতে হইল।

বি ইউনিট্ কোয়েব্যিওক্ গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছে।

শত্রুর নিকট হইতে এই কয়টি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে—

ব্রেন্ গান্	৩
হাত গ্রেনেড্	৮
গোলাগুলি ৩০৩ রাউণ্ড্	১০০

একটি এল-এম-জি, একটি টমি গান এবং একটি রাইফেল জাপানীর পাইয়াছে।

আমাদের নিহতের মধ্যে আছেন—লেফট্ন্যান্ট জ্ঞান সিং ও লেফট্ন্যান্ট মঙ্গুরাম এবং তাহা ছাড়া আরও ৫০ জন সৈনিক।

২০শে মার্চ ১৯৪৫:

আজ পরামর্শ সভা ছিল। কর্ণেল সেহগল সংবাদ দিলেন যে জাপানীদের নিকট হইতে ৭৫টি ট্যাঙ্ক বিধ্বংশী মাইন্ (এ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মাইন্) পাওয়া গিয়াছে এবং উহার ব্যবহার পদ্ধতি আমাদের লোকেরা শিখিয়া লইয়াছে।

সেহগল্ বলিলেন—'হয় আমরা আক্রমণ করিব, না হয় উহারা আমাদের আক্রমণ করিবে। যদি ১ নং ব্যাটেলিয়ানের রণাঙ্গন ভেদ করিতে শত্রু সমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্য দুইটি ব্যাটেলিয়ন্ যেন অটল থাকে; কারণ আমরা যদি পোপা অঞ্চল ছাড়িয়া যাই, তাহা হইলে ১৯।২০ মাইলের মধ্যে জল পর্য্যন্ত পাইব না।

কতকগুলি সৈনিক পলায়ন করিয়া বিপক্ষে যোগদান করিয়াছে। এ সম্বন্ধে নেতাজীর ১৩ই মার্চ তারিখের বিশেষ নির্দেশ পাঠ করিয়া শুনানো হইল।

'আজাদ হিন্দ ফৌজ দলের সকল অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি—কমরেড্স্ আপনারা সকলে জানেন যে গত বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ

ফৌজ দলের অফিসার ও সৈনিকগণ যে সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং তাহারা দেশাত্মবোধ, সাহস ও আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা শত্রু সৈন্যের উপর যে জয়লাভ করিয়াছিল উহার মধ্যেও কয়েকজন অফিসার ও সৈনিকের মনের দুর্ব্বলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা আশা করিতেছিলাম যে নূতন বৎসর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের সকল প্রকার ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দুরীকৃত হইবে। কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই। সম্প্রতি দ্বিতীয় ডিভিসনের হেড্ কোয়াটার্সের পাঁচজন অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে এখনও অনেক দোষত্রুটি আছে এবং ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা সমূলে বিনাস করিবার জন্য আমাদের এখনও চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যদি এখন ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দূর করিতে পারি, তাহা হইলে আমি বলিব যে ভগবানেব কৃপায় এই সকল লজ্জাসূচক ও ঘৃণ্য ঘটনা আমাদের নিকট আশীর্ব্বাদ স্বরূপ আসিয়াছিল। সুতরাং আমাদের সৈন্যবাহিনীর উন্নতির জন্য আমি সকল প্রকার সম্ভব পন্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস যে এই সকল কার্য্যে আমি আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য পাইব।

ভীরুতা ও কাপুরুষতা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে:—

(ক) যদি কেহ তাহার ব্যবহারে ভীরুতার পরিচয় দেয় বা বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করে তাহা হইলে এন. সি. ও বা সিপাহি যাহাই হউক না কেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈন্যই যে কোন পদমর্য্যাদাবিশিষ্ট উক্ত প্রকার যে কোন ব্যক্তিকে বন্দী করিতে বা গুলি করিতে পারেন।

(খ) আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সকল সভ্য নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতে বা সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের আমি ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ ফৌজ ছাড়িয়া যাইবার সুবিধা দিতেছি। এই সুবিধা সংবাদ পাইবার পর এক সপ্তাহ বহাল থাকিবে।

(গ) অনিচ্ছুক সৈন্যদিগকে স্বেচ্ছায় অজাদ ফৌজ ছাড়িয়া দিবার সুবিধা প্রদান ছাড়াও আমি আমাদের সৈন্যদলকে নিখুঁত করিতে চাই। আমাদের সাহায্য করে নাই অথবা বিজয়ের সময়ে আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এইরূপ সন্দেহ যাহাদের প্রতি রহিয়াছে তাহাদের বহিষ্কৃত করিতে হইবে। আমার এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য আমি আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা চাই এবং আশা করি যে যদি কোন ভীরু বা বিশ্বাসঘাতক

আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে এখনও থাকে তাহা হইলে আপনারা এ সম্বন্ধে প্রাপ্য সংবাদ আমাকে বা আমার বিশ্বাসী অফিসারদের দেবেন।

(ঘ) কিন্তু বর্ত্তমানে উপরোক্ত প্রথা অবলম্বন করিলেই আমাদের কার্য্য শেষ হইবে না, ভবিষ্যতেও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ ফৌজদলের প্রত্যেকের চোখ খুলিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহার ফলে তাহারা ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কোন লক্ষণ দেখা দিলেই ধরিতে পারিবে। ভবিষ্যতে আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন ব্যক্তি যদি ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কোন চিহ্ন পান তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি মুখে অথবা লিখে আমাকে বা নিকটস্থ অফিসারদের নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন। অর্থাৎ, এখন হইতে সকল সময় প্রত্যেক সৈন্যের মনে করা উচিত যে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং ভারতীয় জাতির সম্মান ও যশের মূর্ত্ত প্রতীক।

(ঙ) বহিস্করণ ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণের আমাদের সৈন্যবিভাগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিবার পর যদি ভীরু ও বিশ্বাসঘাতকের কোন সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহার শাস্তি হইবে মৃত্যু।

(চ) কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের ভিতর একটি নৈতিক প্রাচীর প্রস্তুত করিতে হইলে, ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণার ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই সৈন্যদলের মধ্যে প্রত্যেকের মনে এই ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ঘৃণ্য কাজ আর নাই। আমাদের সৈন্যবাহিনী হইতে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য কি করিয়া ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জাগাইয়া দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে পৃথক ভাবে নিয়মাবলী প্রদত্ত হইবে।

(ছ) বহিষ্করণের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈন্যকে এই বলিয়া নূতন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইবে যে যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মাতৃভূমির মুক্তি না হয় তত দিন সে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইবে।

(জ) যাহারা কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকের সন্ধান দিতে পারিবে তাহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(স্বাঃ) সুভাষ চন্দ্র বসু

সর্ব্বাধিনায়ক

আজাদ হিন্দ ফৌজ

৩০শে মার্চ ১৯৪৫; লেগ্যি

আমরা লেগ্যির নিকট আছি। কর্ণেল সেহগল আজ আসিলেন।

কর্ণেল সেহগলের নিকট হইতে শুনিলাম যে তিনি যখন এখানে মোটারে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহার গাড়ীর উপর ২৫।৩০ গজ দুর হইতে ভীষণ গুলি বর্ষণ হয়। তাঁহার ধারণা ছিল যে সেখানে কোন বৃটিশ সৈন্য ছিল না। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক; গুলি থামাও।'

জাপানী ভাষায় উত্তর আসিল—'আমরা হিকারী কিকান্ দল। শত্রু কাছেই। তোমরা চলিয়া যাও।'

তাহারা উচ্চে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। সেই অবসরে আমরা চলিয়া আসিলাম। একটি গোলা আমাদের মোটারে লাগিলে আমরা কয় জনে উড়িয়া যাইতাম।'

১নং ব্যাটেলিয়নের একটি দল ঐ স্থানে গিয়াছিল। তাহারা দেখে মোটার ও লরির মধ্যে কতক গুলি শত্রু সৈন্য বসিয়া রহিয়াছে। আমাদের সৈন্যেরা তাহাদের উপর গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিতেই তাহারা সব কিছু ফেলিয়া যে যেখানে পারিল পলায়ন করে। মোটার ও গাড়ীগুলি আমরা দখল করিয়াছি। কর্ণেল সেহগলের মোটারখানিও তাহার মধ্যে ছিল। তাঁহার টুপিটিও গাড়ীর মধ্যেই পাওয়া গেল।

৩১শে মার্চ ১৯৪৫:

কর্ণেল সেহগলের আদেশ অনুসারে রেজিমেন্টের হেড্কোয়ার্টার লেগিয়্যতে আসিয়াছে।

সাইরেন্ বাজিল। বিমান আক্রমণের সতর্কতা। একটি পরিখার মধ্যে বসিয়া আছি। মাথার উপরে বারোখানি বৃটিশ বিমান দেখা গেল। তারপর আরম্ভ হইল বোমা বর্ষণ। অবিরাম গুম্-গুম্ গুম্-গুম্। তিন ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ চলিল। বিমানের শব্দ দূর আকাশে মিলাইয়া গেলে ট্রেঞ্চ হইতে উঠিয়া দেখিলাম—আমাদের ক্ষতি অতি সামান্যই।

৩রা এপ্রিল ১৯৪৫:

আজ আমাদের উপর আক্রমণ চলিয়াছে। কামানের গোলা আসিয়া পড়িতেছে; কর্ণভেদী শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত। আমরাও তাহাদের উত্তর দিতেছি।

আমাদের পিছনের ২নং ঘাটি শত্রু দখল করিয়াছে।

কর্ণেল সেহগল্ ১নং ব্যাটেলিয়নকে আদেশ দিলেন একটি রিজার্ভ দল ঠিক রাখিতে।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৫:

আজও মধ্যে মধ্যে গোলা পড়িতেছে। আমরা অটল আছি। কিন্তু কতকগুলি ভীরু সৈনিক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; ১নং ব্যাটেলিয়নের দুটি প্লেটুন্ শত্রু পক্ষে চলিয়া গিয়াছে।

কর্ণেল সেহগল ১নং ব্যাটেলিয়ন্কে আদেশ দিলেন শত্রুকে আক্রমণ করিয়া আমাদের নষ্ট ঘাঁটি পুনরধিকার করিবার জন্য।

এক দল সেনা বিপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। গুলিবর্ষণের শব্দ শুনিতেছি। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই সংবাদ আসিল—আমাদের আক্রমণ সফল হইয়াছে—ঘাঁটি আবার আমাদেরই হাতে। এই সৈনিকেরা অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছে।

আজ লেফট্ন্যান্ট খাজিন শা পলায়ন করিয়াছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

টেলিফোন যোগে ডিভিসনের হেড্ কোয়ার্টারের সাহিত সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা বৃথা হইল।

কর্ণেল সেহগল্ আদেশ দিলেন আমাদের পোপা পাহাড়ে যাইবার জন্য।

৯ই এপ্রিল ১৯৪৫: পোপা

এখানেও ইহার মধ্যে একবার বৃটিশ এরোপ্লেন বোমা ফেলিয়া গিয়াছে।

আজ কর্ণেল সেহগল অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার জন্য একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—আমরা এখন হইতে ১২ তারিখে তৌঙ্গউয়িঙ্গি যাত্রা করিব।

১২ই এপ্রিল ১৯৪৫: তোঙ্গউয়িঙ্গির দিকে

আমরা আজ পোপা ছাড়িলাম। পথে খবর পাওয়া গেল তৌঙ্গউয়িঙ্গি শত্রুর হাতে পড়িয়াছে। কর্ণেল সেহগল আমাদের বলিলেন যে এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রোমের দিকে অপসরণ করাই ভালো।

১৪ই এপ্রিল ১৯৪৫; ম্যাগউই

আমি ম্যাগউই আসিয়াছি। সংবাদ নৈরাশ্যময়। আমেরিকানরা অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের বিপুল রণসম্ভার ও লোকবলের বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষুদ্র বাহিনী কিছুই নয়। জাপানীদের অবস্থাও ভালো মনে হয় না।

আজ এরোপ্লেনে রেঙ্গুনে রিপোর্ট যাইতেছে।

১৫ই এপ্রিল ১৯৪৫: রেঙ্গুন

লেফটন্যান্ট জ্ঞান সিংএর বীরোচিত মৃত্যুর কথা পূর্বেই বলিয়াছিলাম। আজ কর্ণেল ধীলনের বিস্‌তৃত রিপোর্ট দেখিলাম। কর্ণেল ধীলন লিখিয়াছেন—

“স্থানটি সমতল ভূমি। শত্রুর দৃষ্টি বা গুলি বর্ষণ এড়াইবার উপযুক্ত ‘কভার’ কিছু নাই। কেবল একটি অগভীর শুষ্ক ডোবা আছে। যেখানে তিনটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মিলিয়াছে, এই ডোবাটি ঠিক সেই জায়গায়। এই স্থানের ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি পাহাড় আছে—তাহার উচ্চতা ১৪২৩ ফিট। এই পাহাড়ের পিছনে শত্রু তাহার কামান রাখিয়াছে; সেখান হইতে রাস্তার চৌমাথা এবং তাহার দক্ষিণে যে স্থান তাহার উপর আক্রমণ চালানো

যায়। এই জায়গাটি যদি দখল করা যায় তাহা হইলে শত্রুর পরিকল্পনা ব্যর্থ করা সম্ভব হইবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেকেণ্ড লেফট্‌ন্যান্ট জ্ঞান সিংএর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি কোম্পানি রাখা হইল। জ্ঞান সিং আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এই কোম্পানীতে ৯৮ জন লোক ছিল। তাহাদের কোন মেসিন্ গান বা এমন কি হাল্‌কা কামানও ছিল না। দুটি এটি-কে (ট্যাঙ্ক বিধ্বংশী) মাইন্ ছাড়া তাহাদের আক্রমণ বা আত্মরক্ষার জন্য ছিল কেবল পুরাতন বন্দুক। তাহাদের উপর আদেশ ছিল—যে উপায়েই হউক শত্রুর অগ্রগতি বোধ করিতে হইবে।

তাহারা দুইদিন এই স্থানে রহিল; শত্রু অগ্রসর হইল না।

তারপর ১৬ই মার্চ (১৯৪৫) সকাল হইতে বিপক্ষের জঙ্গী বিমান তাহাদের উপর বোমা বর্ষণ এবং মেসিন গান্ হইতে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় বেলা ১১টার সময় বোমা নিঃশেষিত হইলে এরোপ্লেন্‌গুলি চলিয়া গেল। তারপর আরম্ভ হইল পাহাড়ের পিছন হইতে শত্রুর কামান গর্জ্জন।

এই কামানের গোলাবর্ষণের আশ্রয়ে একদল যান্ত্রিক মোটার বাহিনী আমাদের সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইল। এই দলে ছিল ১৩টি ট্যাঙ্ক, ১১টি আর্মার্ড-কার্ এবং ১০টি ট্রাক্। এই দলের অর্দ্ধেক সোজা ডোবাটির দিকে চলিল। সেখানে আমাদের কোম্পানির দুইটি অগ্রগামী প্লেটুন্ ছিল। আর্মার্ড কারগুলি হইতে তাহাদের উপর বিস্ফোরক বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু আমাদের সৈনিকেরা ইহাতে ভীত হইল না এবং পরিখার মধ্যেই আমাদের পদাতিক বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ট্যাঙ্ক এবং আর্মার্ড কার্‌গুলি ইস্পাতনির্মিত দৈত্যের ন্যায় অগ্নি বর্ষণের দ্বারা নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিয়া এত কাছে আসিয়া পড়িল যে তাহাদের ভারের চাপে আমাদের সৈনিকদের পিষিয়া মরিবার আশঙ্কা হইল। তাহাদের পথের উপর দুটি মাইন্ ছুঁড়িয়া ফেলা হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মাইন্ দুটিই ফাটিল না। কিন্তু একটা জিনিষ হইল—তাহার ফলে ঐ দৈত্যগুলির গতি বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পিল্-বাক্সে পরিণত হইল এবং তাহার মধ্য হইতে অমানুষিক মৃত্যুবর্ষী মারণাস্ত্র বাহির হইতে লাগিল।

এই দলটি এবং ব্যাটেলিয়নের হেড্ কোয়ার্টারের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না। জ্ঞান সিং বুঝিলেন যে তাঁহাদের রাইফেলের গুলি শত্রুর মোটারবাহিত মেসিন গান্, হাল্কা স্বতঃচালিত (অটোমেটিক্) এবং হাত গ্রেনেডের মোটেই সমকক্ষ নয় এবং পরিখায় থাকা মানে নিশ্চিত মৃত্যু বা বন্দী দশা; অথচ শত্রুর কোন ক্ষতির সম্ভাবনাই নাই। তখন তিনি আদেশ দিলেন—‘আক্রমণ কর’ (‘চার্জ্’)।

এই আক্রমণে নেতৃত্ব করিলেন তিনি নিজে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—‘নেতাজীকি জয়’, ‘ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ’, ‘আজাদ হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ’, ‘চলো দিল্লী’। সমস্ত সৈনিক একযোগে তাহার পুনরাবৃত্তি করিল এবং শত্রুর কামানের শব্দ ছাপাইয়া সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। শত্রুর উৎকৃষ্ট যান্ত্রিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে আমাদের বীর সৈনিকদের ইহাই ছিল একমাত্র সম্বল। ভারতের নামে—ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাহার শত্রুর মোটার বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শত্রু তখনি থামিয়া গেল। ইহার পর আরম্ভ হইল হাতাহাতি যুদ্ধ। দুই ঘণ্টা এইরূপ চলিল। আমাদের বীরবৃন্দ পরাজয় বরণ কিছুতেই করিবে না। তাহাদের মধ্যে ৪০ জন দ্বিগুণ-সংখ্যক শত্রু নাশ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। তাহাদের অদম্য তেজে শত্রু বিপর্য্যস্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় জ্ঞান সিং তাঁহার ৩ নং প্লেটুনের কম্যাণ্ডার সেকেণ্ড্ লেফট্‌ন্যান্ট্ রাম সিংকে ডাকিয়া আদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় একটি বুলেট আসিয়া তাঁহার মাথায় লাগিল। তিনি পড়িয়া গেলেন; অর্ডার আর তাঁহাকে দিতে হইল না।

ইহার পর সেকেণ্ড লেফট্‌ন্যান্ট্ রাম সিং অবশিষ্ট সেনাদলকে একত্র করিয়া পুনরায় সংগঠিত করিলেন।

লেফট্‌ন্যান্ট জ্ঞান সিং তাঁহার সৈনিকদের বলিতেন যে তিনি তাহাদেরই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিবেন। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন এবং জীবনে মরণে তাঁহার সঙ্গীদের সহিতই ছিলেন। ইতিহাস চিরদিন এই গৌরবময় বীরত্বের কাহিনীর সাক্ষ্য থাকিবে। লেফট্‌ন্যান্ট জ্ঞান সিং এবং তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল আমাদের মহান্ নেতা—নেতাজীর আদর্শ। তাঁহারা রণক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রাণ দান করিয়া আমাদের অনুসরণের জন্য এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বীর পরাজয় কাহাকে বলে জানেন

নাই। স্বাধীন ভারতে বংশপরম্পরা তাঁহাদের স্মৃতি ভারতবাসী পূজা করিবে এবং এইরূপ উচ্চ আদর্শে জীবন গঠন করিতে ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবে।"

এই বীরত্বের কাহিনী সত্যই অপূর্ব। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সভ্য বলিয়া গর্ব অনুভব করিলাম।

২৩শে এপ্রিল ১৯৪৫:

জাপানীরা আজ রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

রেঙ্গুনে ভারতবাসীর সংখ্যা অনেক। ১৯৪২ সালে ইংরেজরা যখন রেঙ্গুন হইতে পলায়ন করে, তখন তাহারা ইহাদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করে নাই। তাহার ফলে বহু সহস্র ভারতীয় নরনারী ধনপ্রাণ হারাইয়াছিল। রেঙ্গুনের অবস্থা আবার হয়ত সেই রকম হইবে। ভারতীয়রা ভাবী লুঠতরাজ, খুন-জখমের ভয়ে আতঙ্কিত।

আজও আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের মন্ত্রীসভার অধিবেশন হইয়াছিল প্রবাসী ভারতবাসীদের অসহায় অবস্থায় দস্যু তস্করের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা যাইবেন না; ইহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। রেঙ্গুনে প্রায় ৬০০০ আজাদ হিন্দ ফৌজ আছে। রেঙ্গুনের সেনাদল রেঙ্গুনের ভারতীয়দের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য থাকিয়া যাইবে। এই সেনাদলের ভার গ্রহণ করিলেন কর্ণেল লোকনাথন্ এবং আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি জে, এন্, ভাদুড়ীর উপর সকল কর্তৃত্ব সমর্পিত হইল।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের প্রধান কার্য্যালয় রেঙ্গুন হইতে স্থানান্তরিত হইবে।

২৪শে এপ্রিল ১৯৪৫:

আজ নেতাজী রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিবেন। অনেকে বলিতেছে, এখনো আশা আছে—এটা সাময়িক বিপর্য্যয়। তাঁহার শেষ নির্দেশ বাণী প্রকাশিত হইয়াছে:

আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকগণের প্রতি—

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে যেখানে দাঁড়াইয়া আপনারা বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন, গভীর মর্মবেদনা লইয়া ব্রহ্মদেশের সেই সংগ্রামক্ষেত্র হইতে আজ আমাকে বিদায় লইতে হইতেছে। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু ইহা মাত্র সূচনা—বার বার আমাদের সেই চেষ্টায় ব্রতী হইতে হইবে। চিরদিন আমি আশা পোষণ করিয়াছি; তাই পরাজয় বরণ করিয়া লইতে পারিব না।

ইম্ফলের সমতলক্ষেত্রে—আরাকানের জঙ্গল আর ব্রহ্মদেশে আপনারা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। আপনাদের মুক্তি সংগ্রামের এই বীরত্ব কাহিনী চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ্

সুভাষচন্দ্র বসু

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক

২১শে এপ্রিল ১৯৪৫

ইংরেজ ও আমেরিকান বাহিনী দ্রুতগতিতে রেঙ্গুনের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আমাদের সৈন্যদল তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া শ্যামের অভিমুখে চলিয়াছে। নেতাজীও তাহাদের সহিত ব্যাঙ্ককে যাইবেন। সকলেরই ইচ্ছা নেতাজী এরোপ্লেনে যান। স্থলপথে যাত্রা নিরাপদ নয় এবং তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। এরোপ্লেন প্রস্তুত; কিন্তু তিনি তাহাতে যাইতে সম্মত হইলেন না।

নেতাজী বলিলেন—‘আমি আমার বীর সৈনিকদের বিপদের মুখে ফেলিয়া যাইতে পারি না। আমি তাহাদের সঙ্গেই থাকিব।’

কয়েকজন বর্মী নেতা আসিয়াছেন তাঁহাকে বিদায় দিতে। সকলের মুখই বিমর্ষ। নেতাজি বলিলেন—‘আমাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে; কিন্তু ইহাতে দমিলে চলিবে না। আমরা আবার চেষ্টা কবিব। স্বাধীনতা আমাদের আসিবেই।’ সজল নয়নে তাঁহাকে বিদায় দিলাম।

নেতাজি বলিয়াছেন—আবার তিনি আসিবেন—আমাদের সংগ্রামতো এই আরম্ভ। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি। সে দিন কবে আসিবে—কে জানে!

সমাপ্ত

◈Contributor◈

🤖 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Bodhisattwa
- Nettime Sujata
- Mahir256
- Salil Kumar Mukherjee
- Atudu
- Pinakpani

☺ Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

◈Disclaimer◈

⚠

⚔ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

🌏 The content of the book is publically available in the WikiSource.

Do Not redistribute in a commercial way.

Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

◈সমাপ্তি◈

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself

আরও বই

টোল বই

MOBI